বুকের গভীরে

বুকের গভীরে

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৭
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা প্রেস
১০ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৩৮/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯

বুকের গভীরে

চলন্ত অটোরিকশ থেকে তাপসী দেখতে পেল গলির মুখে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠল সে। আজ আবার এসেছে অসভ্য লোকটা! গত সপ্তাহে একদিন হঠাৎ এসেছিল। এরকম দুপুরের দিকে। জঘন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। যে প্রস্তাবটা শুনেই হাত দিয়ে দু-কান চাপা দিয়েছিল তাপসী। ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছিল সারা শরীর। এতটা খারাপ মানুষ হতে পারে? এত কুচক্রী, মতলববাজ, শয়তান?.... হ্যাঁ ঠিকই তো। অশ্বিনী আজ তাপসীর কাছে মূর্তিমান এক শয়তান। কতদিন ধরে দেখছে লোকটাকে। সে তো জানে লোকটা খারাপ। কিন্তু মানুষ কতটা খারাপ হতে পারে? তারও তো একটা সীমা-পরিসীমা থাকে। সেদিক থেকে অশ্বিনী যেন সত্যিই ব্যতিক্রম। তার একের পর এক শয়তানি বুদ্ধির অন্ত নেই। এক ছাদের নীচে স্বামী আর স্ত্রী হিসেবে একরাত কাটানোর পর তাপসী সেই নরক ছেড়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও কি নিস্তার আছে? অশ্বিনী তাপসীর সঙ্গ ছাড়েনি। যখনই অসুবিধেয় পড়েছে, মানে টাকার দরকার হয়েছে তখনই খুঁজে খুঁজে সে ঠিক চলে এসেছে তাপসীর কাছে। নিষ্ঠুর, পিশাচ, হৃদয়হীন ঐ শয়তানের হাত থেকে কবে নিস্তার মিলবে তাপসীর?

অটোরিকশতে মোট পাঁচজন আরোহী। পেছনে তিনজন। সামনে চালকের পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজন। তাপসী পেছনের লম্বা সিটে বাঁ-দিকে একেবারে ধারে বসেছে। তার পাশে বসেছে টাকমাথা এক প্রৌঢ়। কুমড়োপটাশের মতো চেহারা। মুখটা গোল এবং থলথলে। হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে বৈষ্ণব-বৈষ্ণব মুখ করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কিন্তু চলন্ত অটোতে তার পাশে বসে তাপসী টের পাচ্ছে লোকটা কী চিজ! বাঁ-হাতের কনুই চালিয়ে যাচ্ছে তখন থেকে তাপসীর কোমরের কাছে। লোকটার মতলব বুঝতে পেরে তাপসী ডান হাত ভাঁজ করে চেপে ধরে রেখেছে আড়াআড়িভাবে নিজের কোমরের কাছে। কিন্তু লোকটার অবাধ্য অসভ্যতাকে কি আটকানো যায়? যে রাস্তা দিয়ে ইঞ্জিনের একটানা মৃদু গ-র-র-র আওয়াজ তুলে অটো চলেছে, তাতে গর্ত এবং খোদলের অভাব নেই। মফস্বলের রাস্তার অবস্থা যেরকম হয় আর কী। খোস-পাঁচড়াই তার ধূসর, ক্ষয়া-পিচ, ন্যাড়া শরীরের অলঙ্কার। অটোর চাকা এক একটা গর্তে পড়লেই তাপসীর পাশে অসভ্য আরোহীটির পোয়াবারো। ঝাঁকুনির চোটে তাপসীর ডান হাতের বাধা যেইমাত্র একটু শিথিল, অমনি লোকটার লোলুপ কনুই

চকিতে এগিয়ে আসছে তার কোমরের অনাবৃত অংশের দিকে। এভাবেই একবার তাপসীর স্তন এক মুহূর্ত ছুঁয়ে গেল লোকটার কনুই। ইস কী লজ্জা! একবার তার মনে হয়েছিল সে চিৎকার করে ওঠে। প্রতিবাদ করে। লোকটার থলথলে গালে চটাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু নাহ। নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল তাপসী। নিজেকে লোকটার কামুক খোঁচা থেকে বাঁচাতে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। কারণ সে জানে এসব ক্ষেত্রে চিৎকার চেঁচামেচি করে আজকাল তেমন আর ফল হয় না। সে প্রতিবাদ করলে লোকটাও যে চুপ করে তা মেনে নেবে তা তো নয়। সেও হয়তো নানা যুক্তি দেখাবে। চলন্ত অটোর পেছনের আসনের স্বল্প পরিসরে তিনজন প্রমাণ সাইজের আরোহী বসলে সত্যিই হয়তো অসুবিধে হয়। পাশে যে বসে থাকে তার শরীরে ঝাঁকুনির চোটে একটু আধটু হাত লেগেই যেতে পারে। তাতে অতো মেজাজের কী হল? অতো সতীপনা দেখাতে হলে অটোতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে কেন যাওয়া? পয়সা খরচ করে ট্যাক্সিতে গেলেই তো হয়। এই নিয়ে চলবে ক্যাচাল যা আরও অস্বস্তিকর। কেননা অটোর অন্য আরোহীরাও (এই মুহূর্তে যারা সবাই পুরুষ) বারবার তাকাতে থাকবে তাপসীর দিকে, তার শরীরের দিকে। তাদের সেই দৃষ্টিতেও হয়তো তাপসী অনুভব করবে মজা, চাপা কাম এবং তার প্রতি সন্দেহ। তাই মুখে কিছু না বলে তাপসী শুধু আরও জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করেছিল এবং সামনের বাতাইতলা স্টপে নামার জন্যে নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই দূরে তার চোখ পড়ে গিয়েছিল অশ্বিনীর দিকে। গলির ঠিক মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে। ছাই-রং ট্রাউজার। ঘি-রং বুশসার্ট। চোখে চশমা। মাথায় পাকা চুল। সব চুল পাকা। যা শয়তান অশ্বিনীর চেহারায় অন্য রকমের এক সাফিসটিকেশন এনে দিয়েছে। সেটাও অবশ্য মিথ্যে। মাথাময় ঐ পাকা চুলের বোঝা, রোগা—রোগা চেহারা, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা এবং কথায় কথায় দু-আঙুলের ফাঁকে নীল-ধোঁয়া-ওঠা সিগারেট সমেত অশ্বিনীকে দেখে অনেকেরই একজন পাকা বুদ্ধিজীবী কিংবা কলেজের প্রৌঢ় অধ্যাপক বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু তাপসী তো জানে অশ্বিনী শুধুমাত্র ম্যাট্রিক পাশ। অন্তত অশ্বিনী সেটা তাপসীকে দশ বছর আগে প্রথম আলাপের সময় জানিয়েছিল। যদিও তাপসীর ধারণা সেটাও মিথ্যে। অশ্বিনী কোনওদিন সত্যি কথা বলেনি। সে একজন পাকা মিথ্যেবাদী।

—ভাই একটু থামাও তো তাড়াতাড়ি! এখানে নামব।—অরোহীদের এবং চালককে সচকিত করে তাপসী চেঁচিয়ে বলল। যেন রিফ্লেক্স-বশত ব্রেক কষে অটো থামিয়ে দিল চালক। ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল—এখানে নামবেন? বাতাইতলা তো সামনে?—নাহ এখানেই নামব।—তাপসী জোর দিয়ে বলল।—এই নিন ভাড়া। একটা পাঁচ টাকার কয়েন বাড়িয়ে দিল তাপসী চালকের দিকে। দেড় টাকা ফেরত পেল। ঝপ্ করে নেমে পড়ল তাপসী। অশ্বিনী যেন তাকে দেখতে

না পায় এ ব্যাপারে টেনশান এবং সাবধানতা ছিল তার। তাই এতক্ষণ তার পাশে বসে কনুই–চালানো বৈষ্ণবের মুখের দিকে একঝলক তাকাবার কথা খেয়াল হয়নি। একমুহূর্ত তাকালেই তাপসী দেখতে পেত লোকটার মুখের ম্লান বিষণ্ণতা ও হতাশা।

ওপাশ থেকে একটা গাড়ি আসছিল। তবুও ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পেরোলো তাপসী। ছোটখাটো বাজার এলাকা। সারি সারি জামাকাপড়ের দোকান। সেইসব দোকানের পাশ দিয়েই সরু গলি। সেই গলি দিয়ে মিনি মার্কেটের ভেতরে গিয়ে পড়া যায়। দু-বছরেরও বেশি এই অঞ্চলে বসবাস করছে তাপসী। সে এখানকার সবকিছু জানে। আর অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে তাপসী সরু গলি ধরে মার্কেটের ভেতরে পৌঁছে গেল। যেখানে পরের পর শাড়ির দোকান, কসমেটিকসের দোকান। জুয়েলারির দোকানও আছে যেন একটা। তাপসী নিশ্চিত যে অশ্বিনী তাকে খেয়াল করতে পারেনি। রাস্তার যেখানে অটো থামিয়ে সে নেমে পড়েছিল, সেখান থেকে বাতাইতলার মোড় বেশ কিছুটা দূর। এক ঢিল দূরত্ব কোনওক্রমেই বলা যাবে না। বরং দুই কিংবা আড়াই ঢিল দূরত্ব বলাই ভালো। তাপসী জানে এতদূর থেকে অশ্বিনী তাকে দেখতে পাবে না। অশ্বিনীর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই দুর্বল। তার এক চোখে মাইনাস সাত এবং অন্য চোখে মাইনাস আট পাওয়ার।.....অশ্বিনীর চোখকে না হয় আপাতত ফাঁকি দেওয়া গেল। কিন্তু এই ভর দুপুরে বাজারের মধ্যে কতক্ষণ ঘুরবে তাপসী? অশ্বিনী তার অপেক্ষায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে গলির মুখে?.....

দুই

তাপসীর ডান হাতে একটা বিগ-শপার। বাঁ-হাত ফাঁকা। কাঁধে ভ্যানিটি-ব্যাগ। পরনে সালোয়ার-কামিজ। বিগ-শপারটাতে জিনিসপত্র আছে। বেশ ভারী। হবেই তো। আজ মাসের দু-তারিখ। সংসারের নানা জিনিসপত্তর কেনাকাটার ছিল। মশলাপাতি, টুথ-পেস্ট, সাবান, ফিনাইলের বোতল, কমোড পরিষ্কার করার লিকুইড, ওডিকোলনের প্যাকেট এরকম নানা জিনিস। দেবদ্যুতির তো এসব খেয়াল থাকে না। সে শুধু দুটো ব্যাপারে খুব মনোযোগী। ব্যাঙ্কের চাকরি। আর তার পত্রিকা। এক এক সময় মনে হয় নিজের চাকরির থেকে সে পত্রিকাটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। একটা সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক দেবদ্যুতি। সেই পত্রিকার নাম—'বেলা অবেলা'-। প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয়। বেশ মোটা মোটা সংখ্যা। তাপসী সাহিত্য বোঝে না। বুঝতে চেষ্টাও করেনি কোনওদিন। সে শুধু এটুকু বোঝে যে, দেবদ্যুতি যে পত্রিকার সম্পাদক, অনেকের কাছে তার একটা পরিচিতি আছে। কত ফোন যে আসে দেবদ্যুতির। মোবাইল-ফোনে আসে। আবার এমনি ফোনেও আসে। সকালের দিকে কিংবা রাতের দিকে যখন দেবদ্যুতিকে বাড়িতে পাওয়া যায় তখন একের পর এক ফোন আসে তার। অনেক সময় এরকমও হয় যে, দেবদ্যুতি যখন তার মোবাইলে কারোর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ঠিক সে সময়েই সাধারণ ফোনটাও বেজে ওঠে। তখন তাপসী সামনে থাকলে দেবদ্যুতি তাকে চোখের ইশারায় ফোনটা রিসিভ করতে বলে। তাপসীকে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলতে হয়। এতএব ফোনের কোনওটাই অবশ্য অফিস-সংক্রান্ত নয়। সেটা রিসিভার কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলার মুহূর্তেই তাপসী বুঝতে পারে। কারণ ও প্রান্ত থেকে যে ফোন করছে সে হয়তো বলে—দেবদ্যুতির সঙ্গে, একটু কথা বলব। তাপসী প্রশ্ন করে—কে বলছেন? উত্তর আসে—আমি ওর পরিচিত। কেউ কেউ আবার রিসিভার তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বলে—সম্পাদক দেবদ্যুতিবাবু আছেন? এতকাল তাপসী লক্ষ করেছে দেবদ্যুতিকে যারা ফোন করে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। মহিলারা ফোন প্রায় করেই না। দেশে কি মহিলা-লেখকের সংখ্যা কম? কে জানে?

তাপসী অতশত খবর রাখে না। সে সামান্য আদার ব্যাপারি। জাহাজের খোঁজে তার দরকার কী? দেবদ্যুতি যে পত্রিকার সম্পাদক—'বেলা অবেলা' তার নানা সংখ্যাগুলো ডাঁই হয়ে বাইরের ঘরে জমে থাকে। তাপসীর কোনওদিনই তেমন কৌতূহল হয়নি ওসব বইগুলোতে কী আছে পড়ে দেখতে। পড়ার অভ্যাস কোনওকালেই তাপসীর তেমন ছিল না। কোনওরকমে মাধ্যমিকটা পাশ করেছিল

সে। তারপর নার্সিং-ট্রেনিং নিয়েছিল। পড়াশোনার জগতের মেয়ে সে কোনও দিনই নয়। সারাদিনে খবরের কাগজটাও ঠিকমতো পড়া হয়ে ওঠে না। খবরের কাগজ পড়তে গেলেই সে দেখেছে অবধারিতভাবে ঘুম পায়। তাই সে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খবরের কাগজটাই পড়ার চেষ্টা করে। এবং দেখেছে ঘুমও এসে যায় তাড়াতাড়ি।

তবুও 'বেলা অবেলা'-র দু-একটা সংখ্যা সে যে নেড়েচেড়ে দ্যাখেনি তা নয়। চোখ বুলিয়ে দেখেছে পত্রিকাটাতে অনেক কিছু থাকে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। এমনকী উপন্যাসও। আর পত্রিকার সামনে ও শেষদিকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যা থাকে তা হল বিজ্ঞাপন। কত বিজ্ঞাপন যে জোগাড় করে দেবদ্যুতি? কোথা থেকে যে এত বিজ্ঞাপন পায় কে জানে? পত্রিকার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে দেবদ্যুতির সঙ্গে কোনও কথা বলা সমীচীন বোধ করে না তাপসী। তার ভয় হয়। দেবদ্যুতি কত শিক্ষিত মানুষ। সেদিক থেকে সে অশিক্ষিতই বলা যায়। কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলবে! আর তাছাড়া এসব নিয়ে বলবেটাই বা কী? গল্প কিংবা কবিতা তার পড়তে একেবারে ভালো লাগে না। প্রবন্ধ?..... ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। ওসব পড়ে এক লাইনও বুঝতে পারবে না সে।

একদিন অবশ্য স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই তাপসী জানতে চেয়েছিল দেবদ্যুতির কাছে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কী?

—তোমার ঐ পত্রিকাতে কত বিজ্ঞাপন থাকে। এসবের জন্যে বুঝি টাকা পাওয়া যায়?

—নিশ্চয়ই। বিজ্ঞাপনের টাকার জোরেই তো পত্রিকা চলে। তুমি কি ভাবো আমরা নিজের রোজগারের পয়সা খরচ করে ওরকম ঢাউস পত্রিকা বের করি?

—এত বিজ্ঞাপন পাও কোথায়? মানে.....কীভাবে?

—সে অনেক ব্যাপার। তোমার ওসব না বুঝলেও চলবে।

দেবদ্যুতির এরকম নিরুত্তাপ উত্তরে তাপসী চুপ করে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল, তার সঙ্গে পত্রিকার বিষয়ে কথা বলতে দেবদ্যুতি একেবারেই আগ্রহী নয়। কারণটাও যে তাপসী বোঝে না তা নয়। উচ্চশিক্ষিত দেবদ্যুতি সামান্য মাধ্যমিক পাশ একটা মেয়ের সঙ্গে কী কথা বলবে? এই যে তাপসী আজ প্রায় বছর দুই এ বাড়িতে আছে; দেবদ্যুতির মতো একজন সক্ষম, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে একই ছাদের নীচে এতদিন লিভ টুগেদার চালিয়ে যাচ্ছে; এর ফলে তাপসীর সঙ্গে তার কোনও মনের মিল হয়েছে কি? দেবদ্যুতি কি কোনও অর্থেই তাপসীকে ভালোবাসে? ভালোবাসা?.....ফুঃ! তাপসীর ভালোবাসার কথা ভাবলেই আজকাল হাসি পায়। ওসব ভালোবাসা-টাসার প্রতি তারও কোনও বিশ্বাস নেই। প্রেম-ভালোবাসা

এসব সিনেমা-থিয়েটার কিংবা গল্প-উপন্যাসের বস্তু। ভালোবাসতে কি একদিন চেষ্টা করেনি তাপসী? করেছিল তো। অশ্বিনীকে সে একদিন সত্যিই ভালোবেসেছিল। মনের ভালোবাসার টানেই সে একদিন অশ্বিনীর হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল। নিজের সবকিছু তাকে বিশ্বাস করে দিয়েছিল। পরিবর্তে অশ্বিনী তাকে কী দিয়েছে? দারুণভাবে ঠকিয়েছে তাকে অশ্বিনী। তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। তার জীবনটা নষ্ট করে দেবার জন্যে কেউ যদি দায়ী থাকে সে হল ঐ জোচ্চোর লোকটা—অশ্বিনী। তাকে এড়াতে আজও পারেনি তাপসী। দেবদ্যুতির আশ্রয়ে এসেও তাকে এড়াতে পারেনি। অশ্বিনী তার পেছনে আজও ফেউয়ের মতো লেগে আছে।

দেবদ্যুতির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে বটে। কিন্তু সেটা শুধুই শরীরের সম্পর্ক। ভালোবাসার কোনও চিহ্ন সেই সম্পর্কে নেই। সেটা তাপসীর থেকে ভালো আর কে বুঝবে? আর দেবদ্যুতি তাপসীকে নয়, শুধুমাত্র তাপসীর শরীরকে প্রাণপণে ভালোবাসে বলেই তাপসীর মাঝে মাঝে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। কেননা সে জানে তার শরীরের প্রতি দেবদ্যুতির মুগ্ধতা চিরকালীন নয়। চিরকালীন হতে পারে না। কারণ শরীর, বিশেষত মেয়েদের শরীর, চিরকালের নয়। এ ব্যাপারটা নিয়েই আজকাল বেশি ভাবে তাপসী। তার শরীরের প্রতি দেবদ্যুতির এই সংরাগময় আকর্ষণ, এই মোহ কিংবা পাগলামো যখন ক্রমে কমে আসবে; স্তিমিত হয়ে আসবে সময়েরই নিয়মে ধীরে ধীরে; তখন তাপসীর ভাগ্যে কী হবে? দেবদ্যুতি কি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে? আর যদি তাড়িয়েই দেয় তাহলে প্রতিবাদ করার কোনও উপায় কি তাপসীর আছে? কি উপায় আছে? তাদের দুজনের সম্পর্ককে ভদ্রভাবে 'লিভ-টুগেদার' বলা হয় বটে। কিন্তু সাদা বাংলায় তাপসী দেবদ্যুতির রক্ষিতা ছাড়া আর কী?....এভাবে তো আর চলতে পারে না। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তাপসীকে। শরীরের মুগ্ধতা চলে গেলে, দেবদ্যুতির কাছে তার শরীর পুরনো এবং একঘেয়ে কিংবা বিরক্তকর হয়ে গেলে; তাপসীকে যাতে দেবদ্যুতি ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারে তার জন্যে আইনের সাহায্য নেওয়া দরকার। আইনের সাহায্য মানে বিয়ে। দেবদ্যুতি যদি তাপসীকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়; তার সঙ্গে দেবদ্যুতির বিয়ে যদি রেজিস্টার্ড হয়ে যায় সরকারের নথিতে; তাহলে আর তেমন ভয় নেই তাপসীর। স্ত্রী হিসেবেই সে স্বীকৃতি পেতে চায় দেবদ্যুতির কাছে। সামাজিক স্বীকৃতি। এবং আইনগত স্বীকৃতি। কিন্তু দেবদ্যুতিকে এ ব্যাপারে এখনও রাজি করাতে পারেনি তাপসী। বরাবর দেবদ্যুতি তাকে বলে আসছে—ম্যারেজ নিয়ে তুমি এত ইনসিস্ট করছ কেন? আমি ম্যারেজে বিশ্বাস করি না। আমি লিভ-টুগেদারে বিশ্বাসী। তোমার সঙ্গে আমার লিভ টুগেদারের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কোনওদিন নষ্ট হবে না। তোমাকে আমি কোনওদিন তাড়িয়ে দেব না। নিজের অধিকার নিয়েই তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

--কিন্তু আমাদের সমাজ কি এই সম্পর্ককে মেনে নেবে? তোমার আত্মীয়স্বজন

আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা আছে।

—মা মারা যাবার পর কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেহ আমার যোগাযোগ নেই। তারা কী ভাবল না ভাবল তাতে অন্তত আমার কিছু যায় আসে না।

—কিন্তু পাড়ার লোকজন? আমি যখন রাস্তায় বের হই তখন তারা এমনভাবে আমার দিকে তাকায় আমার খুব লজ্জা করে।

—কী দৃষ্টিতে তাকায় বলো?

—...কী আর বলব।.....কেউ কেউ লোভের দৃষ্টিতে তাকায়। আর অনেকেই তাকায় ঘৃণার দৃষ্টিতে।

—তুমি তাদের ইগনোর করো। ওদের দিকে তুমিও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে। ওরা হয়তো জানে না.....দেবদ্যুতি চুপ করে যায়। সিগারেট ধরায়। চোখ ছোট করে টান দেয় সিগারেটে বার বার।

—কী জানে না ওরা?

—যে এই জীবনটা আমার কাছে একটা এক্সপেরিমেন্ট। সমাজের অনেক নিয়ম-কানুনই আমি মানি না। যেমন ম্যারেজ।.....তুমি এত ঘাবড়াচ্ছো কেন? তোমার সঙ্গে আমি বিট্রে করব না। হ্যাভ ফেথ অন মী। জীবনটাকে নিয়ে যে পরীক্ষাটা আমি করতে চাইছি তাতে তুমি আমাকে ফেসিলিটেট করো...সাহায্য করো আমাকে।

দেবদ্যুতির এসব কেতাবী কথাবার্তায় খুব একটা ভরসা কোনওদিনই পায়নি তাপসী। কিন্তু এখন উপায়টাই বা কী? গনগনে আগুনের চুল্লীর মধ্যে সে নিজেই নিজের হাত ঢুকিয়েছে। দেবদ্যুতির সঙ্গে এই শরীরময় জীবন সে নিজেই কবে যেন শুরু করেছে। এর পরিণতি কী হবে সে জানে না। বোঝে না। শুধু নিরন্তর এক অনিশ্চয়তা-বোধে প্রবল কষ্ট পায়।

ডান-হাতে সাংসারিক জিনিসপত্রে বোঝাই বিগ-শপার নিয়ে এই বাজারের মধ্যে এলোমেলো আর কতক্ষণ ঘুরে বেড়াবে তাপসী? অশ্বিনী কি এখনও গলির মুখে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে?....না কেটে পড়েছে? এত সহজে কি তার হাত থেকে নিস্তার মিলবে? নিশ্চয়ই ওর আজ টাকার দরকার। তাই ছুটে এসেছে তাপসীর কাছে। অশ্বিনী কি তাপসীর....স্বামী? আইনত অশ্বিনীকে কি তাপসীর স্বামী বলা যায়? আইনত বলা যায় না। কারণ সামাজিকভাবে তাদেরও দুজনের বিয়ে হয়নি। আর লোকজন ডেকে, অনেকের চোখের সামনে পুরোহিত ডেকে মন্ত্র পড়েও তাদের বিয়ে হয়নি। অশ্বিনী আর তাপসীর বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটে, মায়ের মন্দিরে। শুধু একজন সাক্ষী ছিল সেই বিয়ের। সেই বদমাশটা। কী যেন নাম?....হেমন্ত। লক্কা পায়রার মতো দেখতে ছিল। শয়তান লোকটাকে। বিয়ের দিন রাত্রেই অশ্বিনী টাকা নিয়ে হেমন্তকে ঢুকিয়েছিল তাপসীর ঘরে। ওহ, সে কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা! সেইদিনই অশ্বিনীর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিল তাপসী। পালিয়ে গিয়েছিল তার কাছ

থেকে। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও নিস্তার মেলেনি। অশ্বিনী তাকে ঠিক খুঁজে বের করেছে। সে যাই হোক, অশ্বিনীর কথা তো পুরোপুরি গোপন করেছে তাপসী দেবদ্যুতির কাছে। কোনওদিন কি অশ্বিনী প্রমাণ করতে পারবে যে তাপসীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল? হেমন্তের মতো একজন লম্পটকে সাক্ষী রেখে কালীঘাটের বিয়ের কি কোনও সামাজিক স্বীকৃতি আছে?

একটা শাড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তাপসী। শো-কেসে একটা বালুচরী ডিসপ্লে করা আছে। কী সুন্দর শাড়িটা! তাপসী মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল।—ও দিদি আসেন না—ভেতরে আসেন—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক অল্পবয়সী ছোকরা। ডাকছে তাপসীকে। দোকানের কর্মচারী। কী মনে হল তাপসীর। সে ঢুকে গেল দোকানের মধ্যে। একেবারে ফাঁকা দোকান। ভেতরে দুজন কর্মচারী। আর একপাশে কাঠের ক্যাশবাক্সের সামনে যে লোকটা বসে আছে সে নিশ্চয়ই মালিক। সেই লোকটাই আগ্রহ নিয়ে ডাকল তাপসীকে—আসুন দিদি আসুন—। এই দিদিকে শাড়ি দেখা.....।

—কী শাড়ি দেখাব দিদি? —একজন কর্মচারী জিজ্ঞেস করল।

—কী শাড়ি দেখাবেন?—তাপসী ভাবছিল।

—অনেক রকম শাড়ি আছে। তাঁত আছে। সিল্ক আছে। টাঙ্গাইল আছে। সবরকম দেখাব?

—বালুচরী দেখান তো?

—বালুচরী দেখবেন?—মহা উৎসাহে কর্মচারীটি আলমারির পাল্লা টেনে একের পর এক বালুচরী মেলে ধরতে লাগল তাপসীর চোখের সামনে। রঙ আর রূপের অভাবনীয় এক দৃশ্য! তাপসী যেন চোখ ফেরাতে পারছিল না।

তিন

আলমারি থেকে একের পর এক শাড়ি বের করে আনছে একজন কর্মচারী আর চোখের সামনে মেলে ধরছে। যেন দ্যাখানোর নেশায় পেয়েছে নিরীহ চেহারার, রোগা বেঁটে কর্মচারীটির। তাপসী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।....একটা বালুচরী শাড়ির কত দাম হতে পারে? সে ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে তাপসীর? হ্যাঁ আছে বইকী। সে যখন নার্সিং—ট্রেনিং নিতে যেত তখন একজন মেয়ের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। কতদিন হয়ে গেল। পাঁচ বছর? নাকি ছ বছর? তাপসীর দুই চোখ মুগ্ধ বিস্ময়ে শাড়িগুলো দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মন পিছিয়ে যেতে চাইছিল অনেক পেছনে, সেই নার্সিং-স্কুলের ধূসর দিনগুলোতে। ধূসর? হ্যাঁ ধূসরই তো বটে। মনের কোন গোপন গলি-খুঁজিতে সেইসব নির্ভার, দুশ্চিন্তাহীন, সাদামাঠা দিনগুলো অবহেলিতের মতো পড়ে আছে। নেড়েচেড়ে দেখাও হয় না তেমন। তারপর তাপসীর জীবনে কত ঘটনা ঘটল। নার্সিং-ট্রেনিং শেষ করার পর একটা ছোটখাটো নার্সিং-হোমে চাকরি জুটে গেল। তারপর সেই চাকরি চলে গেল। কারণ সেই বদ চরিত্রের গাইনি ডাক্তার। সত্যিই বদ চরিত্রের ছিল ডাক্তারটা। বয়সে প্রবীণ। চেহারাটাও ছিল বেশ ভদ্র। কিন্তু তার মনটা যে পাঁক-ভর্তি নর্দমা হয়ে আছে সেটা বাইরে থেকে মানুষ কীভাবে বুঝবে? সে সত্যিই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাপসীর। আজও স্পষ্ট মনে আছে সেই মেয়েটার মুখ। বেশ সুন্দরী। শরীরের গড়নও চমৎকার। সদ্য বিবাহিত ছিল মেয়েটা। বিয়ের একবছরের মধ্যেই কনসিভ করেছিল। সে এসেছিল তার স্বামীর সঙ্গে গাইনি ডাক্তারের কাছে নিজেকে পরীক্ষা করাতে। স্বামী মানে কমবয়সী একজন যুবক। মেয়েটার বয়স ছিল বাইশ-তেইশ। আর যুবকের বয়স কত হবে? বড়জোর পঁচিশ? কীরকম আলুভাতে মার্কা চেহারা ছিল যুবকের। একটু থলথলে, মোটাসোটা। মাথায় বেঁটে। তার স্ত্রীকে তার থেকে একটু যেন লম্বাই মনে হয়েছিল। গাইনি ডাক্তারের নির্দেশে মটকু যুবক একতলার অফিস-ঘরে বসেছিল। আর ডাক্তার মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল দোতলায়। সেখানে একটা ঘরে একটাই মাত্র বেড ছিল। প্রসূতিদের এবং অন্য রোগীদের সেই ঘরেই পরীক্ষা করা হত। সেই গাইনি ডাক্তারের কাছে যেসব মহিলা দেখাতে আসত তাদের প্রত্যেকেরই স্বামীকে নীচের অফিস-ঘরে অপেক্ষা করতে বলত ডাক্তার। আর রোগীকে নিয়ে যেত দোতলায়। এর কারণ না হয় তাপসী জানত। স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে হলে সাধারণত ডাক্তারেরা স্বামীকে কাছাকাছি উপস্থিত থাকতে বলেন। হয়তো পরীক্ষার সময় সে তা দেখতে পারবে না। কিন্তু কাছাকাছি উপস্থিত থাকতে পারবে। যাতে

পরপুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজের সব গোপনীয়তাকে উন্মুক্ত করতে স্ত্রী লজ্জা না পায়।

ভোলেভালা চেহারার স্বামী অপেক্ষা করছিল নীচে,—অফিস-ঘরে। আর তার স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তার উঠে এসেছিল দোতলায়,—পরীক্ষা-ঘরে। সেই ঘরের ভেতরে সহকারী নার্স তাপসীরও ঢোকার অধিকার ছিল না। ডাক্তার তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল ঘরের বাইরে। বলেছিল প্রয়োজন হলে ডেকে নেবে।

মেয়েটিকে ঘরের ভেতরে পরীক্ষার জন্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবার পর মিনিট দশ কেটে গিয়েছিল। একরাশ অস্বস্তি নিয়ে তাপসী অপেক্ষা করছিল বাইরের করিডরে। মেয়েরা বোধহয় সত্যিই পুরুষদের চোখ দেখে সব বুঝতে পারে। গাইনি-ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি দেখে তাপসী একা একা অনুভব করেছিল যে, সদ্য-বিবাহিত সেই মেয়েটার দিকে তার তাকানোর ভঙ্গিটা ভালো নয়। কীরকম যেন এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল তার। আর তার মনের গোপন আশঙ্কা যে সত্যিই প্রমাণিত হবে সেদিনই, সে তা কী করে বুঝবে? করিডরে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎই মেয়েটার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে তাপসী সচকিত হয়ে উঠেছিল। ঘরের ভেতর থেকে মেয়েটা আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে বলছিল—একী করছেন আপনি? একী? অসভ্যতা করছেন আমার সঙ্গে? ছি ছি ছি! আপনি ছোটলোক! ইতর! দরজা খুলুন। আমি বাইরে যাব ...।

তাপসী বুঝেছিল সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। সে দরজাতে ধাক্কা দিয়েছিল। বলেছিল—কী হচ্ছে কী ভেতরে? ডাক্তারবাবু দরজা খুলুন!

ডাক্তারকে দরজা খুলতে হয়নি। তড়িঘড়ি দরজা খুলেছিল মেয়েটি। বিস্রস্ত বেশবাস। চোখে যুগপৎ ঘৃণা আর হতাশার ছায়া। কপালের গোল সিঁদুর-টিপ কীরকম ধবড়ে গেছে। তাপসী প্রশ্ন করেছিল—কী হল? কী হয়েছে বোন? রাগে ঝকঝক করছিল মেয়েটার সুন্দর চোখদুটো। সে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বলেছিল—এই লোকটা ইতর! ডাক্তার হতে পারে কিন্তু ছোটলোক! ও আমার সঙ্গে অসভ্যতা করছিল...?

এরপর আর কী? মেয়েটার ক্রমাগত চিৎকার-চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হওয়া, একসময় পাড়ার ছেলেদের চড়াও হওয়া নার্সিংহোমে। ভাঙচুর, মারধর ডাক্তারকে। থানা থেকে পুলিশের আগমন। ডাক্তারের বিরুদ্ধে মেয়েটার এফ. আই. আর। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল ডাক্তারকে। কেসও রুজু করেছিল। এসব ঘটনার একটিও হয়তো কারণ ছিল না তাপসীর চাকরি যাওয়ার। কিন্তু পুলিশ ডাক্তারের বিরুদ্ধে কেস সাজাতে যখন ঘটনার একজন সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাপসীকে সাক্ষী মানল এবং কেস আদালতে চলাকালীন বিচারকের সামনে তাকে ডাক্তারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হল; তখনই তাপসী বুঝল সে একটা বড় ভুল করে ফেলেছে। প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের সামনে সরকারি উকিল তাপসীকে জিজ্ঞেস

করেছিল—আচ্ছা আপনার কি মনে হয় অভিযুক্ত সত্যিই অভিযোগকারিণীর শ্লীলতাহানি করেছিল? তখন তাপসী একটুও থমকায়নি। তার মনে হয়েছিল সে যা ভেবেছে সেটাই বলা উচিত। সে কেন লম্পট ডাক্তারকে বাঁচাতে যাবে?

উকিলকে তাপসী বেশ স্পষ্টভাবে বলেছিল—ঘর বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে কী ঘটেছিল সেটা আমি দেখতে পাইনি। তবে ঐ ভদ্রমহিলা যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন তাতে-আমার মনে হয়েছিল ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই আপত্তিজনক আচরণ কিছু একটা করেছিলেন। তাছাড়া ...

—তাছাড়া? ... সরকারি উকিল স্থির চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে।

—তাছাড়া ঐ মহিলাকে আমার ভদ্র বলেই মনে হয়েছিল। কোনও ভদ্র মেয়েই নির্দোষ কোনও পুরুষের বিরুদ্ধে বিনা কারণে অভিযোগ করে না। তাতে তো মেয়েটিরই সব থেকে বেশি লজ্জা পাওয়ার কথা।

কথাগুলো বলার সময় একটুও গলা কাঁপেনি তাপসীর। সে যা সত্যি বলে ভেবেছিল তাই বলেছিল। তার এরকমই স্বভাব। মিথ্যে সে বলতে পারে না। কিন্তু তাই কি? সত্যিই কি কোনওরকম মিথ্যাচারণ তাপসীর স্বভাবে নেই? তাই বা হবে কেন? নিজের জীবনে সত্যিই কি এরকম সত্যবতী নীতি নিয়ে চলতে পেরেছে তাপসী? আগাগোড়া তা মেনে চলতে পেরেছে? ঘনিষ্ঠ হবার বেশ কিছুদিন পর দেবদ্যুতি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, একমাত্র সে-ই তার জীবনে প্রথম পুরুষ কি না। তখন তো সত্যি বলতে পারেনি তাপসী। বেশ সাবলীলভাবে বলেছিল, তা নয়তো কী। তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি কোনওদিন শরীর দেবার কথা ভাবিনি। মনও না।

...আচ্ছা, পুরুষেরাই বা এরকম বোকা হয় কীভাবে? কেন কোনও মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করার পরই তাদের প্রায় প্রত্যেকে এরকম বোকা-বোকা প্রশ্ন করে? এই প্রশ্নটা না করে কি তারা থাকতে পারে না? দেবদ্যুতিকে অনেক ব্যাপারেই অন্যরকম মনে হয় তাপসীর। কিন্তু এই প্রশ্নটা যেদিন তাকে সে করেছিল, সেদিন দেবদ্যুতিকে সত্যিই সাধারণ, অতি-সাধারণ মনে হয়েছিল তাপসীর।

...যাক সে কথা। এখন তো সে নিজের অতীতের কথাই ভাবছিল। ডাক্তারের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার কিংবা বলা যায় নির্ভীক সত্যকথনের পরদিনই তাপসী বুঝেছিল নার্সিংহোমে তার চাকরিটা আর নেই। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তাপসী চাকরিস্থলে পৌঁছবার টয়লেটে ঢুকে নিজের সালোয়ার-কামিজ খুলে নার্সিং-হোমের তকমা-মারা ড্রেস পরে নেবে বলে অফিস ঘরে পোশাক নিতে ঢুকেছিল। তখনই সিনিয়র নার্স মল্লিকাদি বলেছিল—আজ আর তোমাকে ড্রেস পরতে হবে না তাপসী।

—ওমা কেন? —অবাক হয়ে তাপসী জানতে চেয়েছিল। —এই বাইরের

পোশাকে পেশেন্টের বেডের কাছে যাব নাকি?

—আমি জানি না। —মল্লিকাদি যেন তাপসীর চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। —তুমি অফিসঘরে ডঃ রক্ষিতের সঙ্গে একটু কথা বলে নাও।

ডঃ রক্ষিতই নাকি সেই নার্সিংহোম-এর মালিক। ঠাণ্ডা গলায় মধ্যবয়স্ক লোকটি জানিয়েছিল তাপসীকে—আপনাকে আর এখানে কাজ করতে হবে না। আমাদের ছোট নার্সিংহোম। পাঁচজন নার্স। আপনি এক্সট্রা ছিলেন। গত কয়েকমাস ধরে আমাদের নার্সিংহোম ভালো চলছে না। পেশেন্টের অ্যাডমিশান ক্রমাগত ফল করছে। ৬ জন নার্স আমাদের আপাতত দরকার নেই। আপনার অ্যাড্রেস তো আমাদের কাছে রয়ে গেল। দরকার পড়লে জানাব। ...

সেই প্রথম একটা চাকরি পেয়েছিল তাপসী। বড় অল্প দিনের ছিল চাকরিটা। সে বুঝেছিল আদালতে সত্যি কথা বলার জন্যে কিংবা গাইনি-ডাক্তারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কারণেই আসলে তার চাকরিটা গিয়েছিল। যদিও এর কার্য-কারণ সূত্র ঠিক মেলাতে পারেনি তাপসী। তার মানে ঐ বদমাশ ডাক্তারের অপরাধের সাজা হোক এটা নিশ্চয়ই চায়নি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। কেন আবার? ডাক্তারের বদনাম মানে তো নার্সিংহোমেরও বদনাম। আর সেই বদনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান ইন্ধন জুগিয়েছে তো সেই নার্সিংহোমেরই একজন অতি-সাধারণ এবং অস্থায়ী কর্মচারী।

—বলুন দিদি? একটা বালুচরী দিয়ে দিই? কোনটা নেবেন? আগুন-রং এটা আপনাকে দারুণ মানাবে ....। —নিরীহ চেহারার কর্মচারী অনেকক্ষণ ধরে অনেকরকম বালুচরী তাপসীর সামনে ডাঁই করে ফেলার পর সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে বসল। আলতো একটা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে তাপসী শাড়ির পাড়গুলো একটা একটা করে খুঁটিয়ে দেখছিল। শুধু তার চোখই একমাত্র ক্রিয়াশীল নয় এই মুহূর্তে। তার মনও তো ছুটতে শুরু করেছিল। এখনও ছুটছে। পেছনদিকে।

নার্সিংহোমের চাকরির কথা মনে পড়েছিল নার্সি-ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়ার পর। আর নার্সিং-ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়েছিল দোকানে এসে বালুচরী শাড়িগুলো দেখে। নার্সিং-ট্রেনিং নিতে গিয়েই সে আসলে প্রথম জেনেছিল বালুচরী শাড়ির নাম। তার আগে বালুচরী বলে যে কোনও শাড়ি হয় এটা জানত না।

মোট পঁচিশ জন ছিল তাদের ব্যাচে। তাদের মধ্যে একজন ছিল সুলেখা। টাইটেল আজ আর মনে নেই। বেশ দেখতে ছিল সুলেখা। পঁচিশ জন মেয়ের মধ্যে সবথেকে সুন্দরী। লম্বা, দোহারা চেহারা। মুখশ্রী ভালো। গায়ের রং ফর্সা। তাপসীও অবশ্য ফর্সা। আর তার শরীরের বাঁধুনিও যথেষ্ট ভালো। কিন্তু তার মুখশ্রী যে ভালো নয় সত্যবাদী আয়নার দৌলতে সেটা কি তার জানতে বাকি আছে? তার মুখে অনেক খুঁত আছে। অশ্বিনীর মতো সাধারণ এবং হারামজাদা চরিত্রের পুরুষ হয়তো তাকে পছন্দ করেছিল। যদিও তাপসীর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে

তার আলটিমেট মতলব ছিল অন্য। কিন্তু দেবদ্যুতির মতো হ্যান্ডসাম এবং শিক্ষিত পুরুষের তাকে কীভাবে ভালো লাগতে পরে?

সে যাই হোক, নার্সিং-ট্রেনিং পর্ব শেষ হয়েছিল। সার্টিফিকেট নিতে আসার দিন মেয়েরা নানারকম সেজে এসেছিল। তাপসীও সেজেছিল। কিন্তু সুলেখার সাজ ছিল সকলের থেকে সুন্দর। হালকা গোলাপী-রং, অপূর্ব আঁচলের শাড়ি পরেছিল সুলেখা। তাপসী তাকে হঠাৎই জিজ্ঞেস করেছিল—এই শাড়িটা কোথা থেকে কিনেছ ভাই?

—ওমা জানো না? এটা তো বালুচরী ...। সুলেখা জানিয়েছিল।

—বালুচরী? সেটা কী শাড়ি? —সত্যিই তাপসী জানত না।

—এই শাড়ি হল বিষ্ণুপুরের তাঁতিদের তৈরি।

—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ... তুমি আগে দেখোনি বালুচরী শাড়ি?

—নাহ। বিষ্ণুপুরে তোমাদের কেউ থাকে বোধহয়?

—আত্মীয়স্বজন কেউ থাকে না। ... আমার ভাবী বর থাকে। —হেসে তাপসীকে জানিয়েছিল সুলেখা।—বিষ্ণুপুর ব্লক অফিসে কো-অপারেটিভ ইনসপেকটর। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

—ও তাহলে এই শাড়িটা উপহার পেয়েছ বলো?

—হ্যাঁ তাইতো। ... ও দিয়েচে। —লাজুক হেসেছিল সুলেখা।

—তোমাকে এই শাড়িটাতে খুব সুন্দর মানিয়েছে।

—বালুচরী পরলে তোমাকেও সুন্দর দেখাবে। ... তোমার একটা চাই? ওকে বলব?

—কীরকম দাম গো এই শাড়িগুলোর?

—দাম ভাই একটু বেশি।

—তবুও?

—এটার দাম উনিশশো টাকা।

দামটা শুনে চমক খেয়েছিল তাপসী। উনিশশো টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনবে? কে টাকা দেবে তাকে? বাড়ির একমাত্র রোজগেরে পুরুষ দাদাকে এই কথা বলা যাবে? একটা শাড়ির দাম উনিশশো টাকা শুনলে দাদা মুখ বেঁকিয়ে বলবে—ওসব আমাদের জন্যে নয়। ওসব বড়লোকদের খুকীদের জন্যে। আর এই কথা বলার পরই অনিবার্যভাবে দাদা মুখখারাপ করত। বলত—বড়লোকগুলো সব কটা খানকির বাচ্চা ... ওদের ছেলেমেয়েগুলোও তাই। ... সকাল আটটার সময় কাজে বেরিয়ে যেত দাদা। কাজ করত লেদমেশিনের কারখানায়। দুপুরবেলা একবার খেতে আসত বাড়িতে। তারপর আবার কারখানায় লেদ-মেশিন ঠেলতে বেরিয়ে যেত এবং বাড়ি ফিরত বেশ রাত করে মদ-ভাঙ খেয়ে। প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ

মদ গিলে বাড়ি ফিরত দাদা। এখনও হয়তো ফেরে। বিয়ে থাওয়া করল না। তাপসীর বোন মানসী মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। টাকাপয়সা নিতে। তার মুখেই শোনে তাপসী দাদা খুব রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল সব নাকি শাদা হয়ে গেছে। এখন দিনের বেলাতেও মদ গিলে বসে থাকে। টালির চালের সেই দুটো ঘরের বাড়িতে একাই থাকে দাদা। আজকাল পেটে নাকি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। তখন কাটা ছাগলের মতো মাটিতে পড়ে ছটফট করে। বস্তির প্রতিবেশীরা ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তারের পরামর্শে অনেকরকম টেস্ট হয়েছে। মানসীর সন্দেহ দাদার পেটে ক্যানসারের জীবাণু বাসা বেঁধেছে। হতেই পারে। নিজের পেটের ওপর কম অত্যাচার তো করেনি দাদা। তাপসীর বারবার মনে হয়েছে দুঃখে, যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতি প্রবল ধিক্কার নিয়ে দাদা জেনেশুনে নিজের জীবনটা নষ্ট করেছে। বেসরকারি অফিসে সামান্য পিয়নের কাজ করত বাবা। একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে পড়ল দুর্ঘটনায়। যে বাসটা ধরতে চেয়েছিল সেটা তাপসীর বাবা ঠিকমতো উঠতে পারার আগেই আচমকা ছেড়ে দিয়েছিল। পড়ে গিয়েছিল বাবা। পেছনের ভারী চাকা চলে গিয়েছিল পেটের ওপর দিয়ে। মৃত্যু আসতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল মাত্র। দাদা কলেজে পড়ছিল। প্রথম বছর। বাড়িতে অভাব। হাঁড়ি চড়ে না ঠিকমতো দুবেলা। দাদার পড়াশোনা শেষ করে অন্তত একটা ভদ্রস্থ চাকরি জুটিয়ে নেবার স্বপ্ন ছিল। যখন বাবা বেঁচে ছিল নিজের আটপৌরে স্বপ্নটার কথা বলেওছে দাদা কখনো কখনো। ...পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে সরকারি অফিসে একটা ক্লার্কের চাকরি নিশ্চয়ই পাব বল তাপসী? পিয়নের চাকরি মানে তো অফিসারদের ফাই-ফরমাশা খাটা। ওদের চা-জল দেওয়া। পান, সিগারেট এনে দেওয়া। প্রতিদিন সামান্য ভাত-কাপড়ের জন্যে বাবাকে কত অপমান সহ্য করতে হয় ভেবে দেখেছিস? আমাকে ভদ্দরলোকের চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যই দাদার স্বপ্নের বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিল। তবুও উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ তো ছিল দাদা। সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি তো পি. এস. সি.-র পরীক্ষা দিলে পাওয়া যেত। কিন্তু সেই পরীক্ষার জন্যে নিজেকে তৈরি করার সময় কোথায় পেল দাদা? বাড়িতে তখন শুধু অভাব অভাব আর অভাব। মায়েব দু-গাছা চুড়ি আর সোনার হার বিক্রি হয়ে গেল। কোনও জমানো টাকাই রেখে যেতে পারেনি বাবা। বাড়িতে অভাবের সঙ্গে অশান্তি। তাপসী মাধ্যমিক পাশ করে বসে ছিল। মানসীর ক্লাশ এইট চলছিল। সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। যে কোনও একটা কাজ দরকার। টাকার দরকার। চোখে অন্ধকার দেখছিল দাদা। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে সারি সারি লেদ-মেশিনের কারখানা। কাছাকাছিই বস্তিতে থাকত তাপসীরা। সেই লেদ-মেশিনের কারখানাতে হাজার টাকা মাইনেতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হল দাদা। কোনওরকমে সংসারটা বাঁচল। তারপর তাপসী একদিন অশ্বিনীর সঙ্গে পালিয়ে গেল। মানসীর জীবনটাও তো প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। বছর তিন আগে মা এই পৃথিবীর গোলমেলে মায়া কাটিয়েছে। বস্তির বাড়িতে দাদা একা

থাকে। মানসীর মুখে সব খবর পায় তাপসী। একদিন হাওড়ার ঐ বস্তিতে গিয়ে দাদাকে দেখে আসারও ইচ্ছে হয়। কিন্তু কীভাবে যাবে? অশ্বিনীর সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর একদিন বাড়িতে গিয়েছিল তাপসী। একা গিয়েছিল! অশ্বিনী যায়নি। বাড়ির দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দাদা। মারমুখী হয়ে তাপসীকে বলেছিল—শালী! হারামজাদী! আমাদের মুখ ডুবিয়েচিস! এ বাড়িতে ঢুকবি না! আজ ছেড়ে দিলুম। দ্বিতীয় দিন দেখলে খুন করে ফেলব। তোর মুখদর্শন করতে চাই না আমরা। শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হয়নি। একটা কাটারি নিয়ে শাসিয়েছিল—সত্যিই খুন করে ফেলব! শালী বেশ্যা! ... তুই একটা প্রস...! এরকমভাবেই গালাগাল দিয়েছিল দাদা। সেই থেকে ও-বাড়িতে আর যায়নি তাপসী। এমনকী মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও যায়নি। আলাদা করে শ্মশানে এসেছিল। নিজের বাড়িতে মায়ের শ্রাদ্ধ করেছিল আলাদাভাবে। তাপসীও বরাবর খুব জেদি মেয়ে। দাদার বাড়িতে পা দেবে না। এটা তারও প্রতিজ্ঞা ছিল। মনে হয় দাদার ক্যান্সারই হয়েছে। সারাদিন খাবার-দাবার না খেয়ে শুধু মদে চুর হয়ে থাকলে তো সেরকমই হওয়ার কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে রাগ আর অভিমান ভুলে একবার যায় দাদার কাছে। তারপরই আবার মনে হয়েছে সত্যিই যদি দাদার হাতে খুন হতে হয়? তাছাড়া নিজের আত্মসম্মানের প্রশ্নও তো আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে কি সত্যিই ভুল করেছিল ঝোঁকের মাথায় অশ্বিনীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে? মানসী তো দাদার সঙ্গেই রয়ে গেল। নিজের চেষ্টায় বি. এ. পাস করল। আবার প্রাইমারি স্কুলে একটা চাকরিও জুটিয়ে নিল। দাদার সঙ্গে লড়াই করেই মানসী বেঁচে আছে। যদিও ২৮-২৯ বছর বয়স হলেও সে এখনও বিয়ে-থাওয়া করেনি। নিজের স্বার্থেই দাদা হয়তো তার বিয়ের চেষ্টা করেনি। দাদার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, দাদা যদি মারাই যায়, তাহলে মানসী একা একা ঐ বস্তির টালির চালায় থাকবে? দুর তা আবার হয় নাকি? তাহলে কি তাপসীর কাছে এসে থাকবে? তাই বা কী করে হয়? দেবদ্যুতি কীভাবে নেবে ব্যাপারটা? দেবদ্যুতির সঙ্গে মানসীর সম্পর্কটাই বা কী হবে? এসব ভাবতে চাইলেই চোখে যেন অন্ধকার দেখে তাপসী। মনে হয় আদিগন্ত বিস্তৃত একটা ফাঁকা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কেউ নেই। সময়টা রাত। রাশি রাশি অন্ধকারের ঢেউ প্রবল আক্রোশে গিলে খেতে আসছে তাকে...।

চার

বালুচরী শাড়িগুলো দুচোখ ভরে অনেকক্ষণ দেখল তাপসী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হাত দিয়ে, স্পর্শ করে দেখেই যেন আশ মেটাতে চাইছিল। সেই কবে বছর সাত আগে নার্সিং-ট্রেনিং-স্কুলে সুলেখার পরনে দেখেছিল বালুচরী শাড়ি। তারপর আর এই শাড়ির কথা মনেই ছিল না। তার কারণও ছিল হয়তো। শাড়ির দিকে আজকাল আর তেমন ঝোঁক অনুভব করে না তাপসী। শাড়ি তো পরাই হয় না তেমন। আজকাল, ঠিকমতো বলতে গেলে অশ্বিনীর সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে এতোল-বেতোল বিয়ের পর থেকেই শাড়ি পরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে তাপসী। বাড়িতে ম্যাকসি, নাইটি আর বাইরে সালোয়ার কামিজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন প্যান্ট আর শার্টেও বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করে সে। দেবদ্যুতি পছন্দ করে জিনস-ট্রাউজার আর হালকা-রং টপ। মুখে না বললেও দেবদ্যুতির চোখের দৃষ্টি থেকে তাপসী বুঝতে পারে ঐ পোশাকের প্রতি তার অনুমোদন। সুতরাং শাড়ির খোঁজ স্বাভাবিক কারণেই আর রাখতে চায় না তাপসী।

কিন্তু আজ অশ্বিনীর হাত থেকে মুক্তি পেতেই সে যখন আচমকা এই মার্কেটে ঢুকে পড়ল এবং ঘুরতে ঘুরতে চলেও এল এই শাড়ির দোকানটাতে, তখন অনেকদিন পর আবার বালুচরী শাড়ি দেখার আনন্দ পেল সে যেন নতুনভাবে। এক একটা শাড়ির আঁচলের কাজ কী যে অপূর্ব! পুরাণের চেনা গল্প-কথাই তাঁতিরা নিজেদের স্বাভাবিক শৈল্পিক প্রতিভায় বালুচরী শাড়ির আঁচলে বুনে রেখেছে। রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ। ভিখিরির ছদ্মবেশে রাবণকে পরম শ্রদ্ধায় ভিক্ষে দিচ্ছে সীতা। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা। গল্প বা কাহিনী বলতে এই কয়েকটা। এগুলোই অসামান্য দক্ষতায় এক একটা শাড়ির আঁচলে সোনালি সুতোয় বুনেছে তাঁতশিল্পীরা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রতিটি শাড়িই কিনে নিতে বাসনা হয়। কিন্তু এই শাড়িগুলোর দাম তো আরও অনেক বেশি মনে হচ্ছে। ... আড়াই হাজার ... তিন হাজার ... সাড়ে তিন হাজার। ব্যাগে মাত্র পাঁচশ টাকার মতো পড়ে আছে। যে কোনও একটা শাড়ি পছন্দমতো সুবিধেজনক ইনস্টলমেণ্টে কি নেওয়া যায়? বললে হয়তো দিয়ে দেবে। প্রথমে না হয় পাঁচশ টাকাই অ্যাডভান্স করবে? এই তো সামনে বাড়ি। হেঁটে চলে যাবে। মানিব্যাগ যদি শূন্যই হয়ে যায় কী অসুবিধা? তার পরই মনে হল, কোথায় পরবে এই শাড়ি? বাড়িতে গায়ে জড়িয়ে পাগলী সেজে বসে থাকবে? দেবদ্যুতিই বা কী মনে করবে? নিজের বিরক্তি বা অপছন্দ সে মুখ ফুটে তেমন কিছু তাপসীকে

বলে না। শুধু দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। সেই দৃষ্টিতে বিরক্তি থাকতে পারে। আবার বিদ্রূপও থাকতে পারে। দেবদ্যুতির মনে বিরক্তি যাতে না আসে সে ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হয় তাপসীকে। সে যাতে কোনও কারণে তাকে বিদ্রূপ না করতে পারে সেজন্যেও তটস্থ থাকতে হয়। শুনতে কিংবা ভাবতে যতই খারাপ লাগুক আসলে তো দেবদ্যুতির সেবাদাসী। হ্যাঁ, আসল সত্যি তো এটাই। সাদা বাংলায় সে দেবদ্যুতির রক্ষিতা। সুতরাং মালিক কিংবা কর্তৃপক্ষের মন যুগিয়ে চলাই হল তার প্রধান কাজ। অতএব সে এমন কোনও কাজ করবে কেন যাতে দেবদ্যুতির বিরক্তি উৎপাদন হয়। সে কারণেই ফট করে একটা বালুচরী কিনে নেওয়া হঠকারীতাই হয়ে যাবে। আর তাছাড়া ... তাছাড়া এতসব আবোল-তাবোল ভাবনারই বা দরকার কি? ধারে জিনিস কেনা তার আদৌ পছন্দ নয়। ওটা একটা খারাপ অভ্যেস। চেনা-শোনা নেই এই শাড়ির দোকানের মালিককে সে ধারের কথা বলবেই বা কীভাবে? তাপসীর মুখ দেখে দোকানের লোকটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল তার মনে চিন্তার নানা রকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলছে। দোকানের বিক্রেতারাও ক্রমশ এক-একজন মনস্তত্ত্ব-বিশারদ হয়ে ওঠে। ক্রেতাদের মন ঠিকমতো পড়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ক্রমশ তাদের আয়ত্ত করতে হয়। যে ছোকরা এতক্ষণ একের পর এক বালুচরী শাড়ি নামিয়ে আনার পর বেশ ক্লান্তি বোধ করছিল সে ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা—কোনটা নেবেন দিদি? এটা? আগুন-রং? ... এটা আপনাকে মানাবে ভালো। ... নাহ, তাপসী আজ বালুচরী শাড়ি কিনবে না। আগুন-রং ঐ শাড়িটাই অবশ্য তার সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে। ওটার সঙ্গে ঝোলানো দামের টিকিটটাও সে দেখে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সব থেকে দামি ঐ শাড়িটাই। ২৭৫০ টাকা। ... এই মুহূর্তে তার ব্যাগে আছে মেরে কেটে ৫৫০ টাকা। এই টাকাপয়সার ব্যাপারেও দেবদ্যুতির এক ধরনের বিচিত্র উদাসীনতা আছে। কিংবা বলা যায় তাপসীর ওপরে এক ধরনের নির্ভরতা আছে। মাসের প্রথমে সে সাত-আট হাজার টাকা দিয়ে দেয় তাপসীর হাতে। মুখে বলে—সংসার খরচের টাকা। আপাতত এটা থাক। আবার লাগলে দেব। ...আবার আর লাগবে কেন? দুজনের খেতে অতো টাকা কি লাগে? আগে যখন দেবদ্যুতির মা বেঁচে ছিল, তখনও তো আট হাজার টাকা তাপসীর হাতে তুলে দিত দেবদ্যুতি। তার মা মারা গেছে মাস ছয়েক। বাড়ির একজন সদস্য কমেছে। কিন্তু টাকার অঙ্ক কমায়নি দেবদ্যুতি। প্রতি মাসের প্রথমে সে যখন তাপসীর হাতে টাকাটা তুলে দেয়, তখন তাপসীর মনে হয় সে দেবদ্যুতির কাছ থেকে স্ত্রীর সম্মান পাচ্ছে। বলা যায়, 'স্ত্রীর মতো' সম্মান পাচ্ছে। হ্যাঁ 'মতো-' ই তো। দেবদ্যুতি তো তাকে এখনও স্ত্রীর সম্মান দেয়নি। তাপসী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার বলতে চেয়েছে কথাটা। ... 'আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা তো সেরে ফেললেই হয়', — এটা সময়ে-

অসময়ে কতবার সে বলেছে দেবদ্যুতিকে। আর যখনই এরকম বলেছে দেবদ্যুতি রেগে যায়নি কখনও। গম্ভীরও হয়ে যায়নি। দু-কথা শুনিয়েও দেয়নি। শুধু তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়েছে। তাকিয়েই থেকেছে কিছুক্ষণ। অস্বস্তি বোধ করেছে তাপসী। তারপর কয়েকমুহূর্ত বাদে দেবদ্যুতি হেসে বলেছে—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না কেন? আমি তোমাকে কোনওদিন ঠকাব না। তাড়িয়ে দেব না। ...কিন্তু বিয়েও করব না। জীবনকে নিয়ে এটা আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট। সেই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যেতে তুমি আমাকে অ্যাসিস্ট করো তপু ...সাহায্য করো আমাকে। প্লিজ ...আমাকে ফেসিলিটেট করো। আইনত বিয়ে না হলে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে একসঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে না কেন? ওদের দেশে তো পারে।...

ওদের দেশ বলতে যে ইউরোপের দেশগুলোর কথাই বলতে চাইছে দেবদ্যুতি সেটা তো অল্প-শিক্ষিত তাপসীও বোঝে। কিন্তু দেবদ্যুতির এই কথাতে সে আদৌ স্বস্তি পায় না। বরং তার মনে কিছু প্রশ্ন ধেয়ে আসে। এবং সেই প্রশ্নগুলো দেবদ্যুতির কাছে প্রকাশও করেছে সে অনেকবার। তাপসীর প্রশ্নগুলো এই ধরনের।

—আমাদের দেশটা তো এখনও ওদের দেশ হয়ে যায়নি? আমাদের সমাজটাও অন্যরকম। বিয়ে না করে এখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকলে লোকে খারাপ চোখে দেখে। মেনে নিতে চায় না। ভাবে সম্পর্কটা ....

—অবৈধ এই তো? —দেবদ্যুতি শূন্যস্থান পূরণ করে। —সে যদি বলে তো বলবে? লোকের কথায় অত কান দিও না। ওসব অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত লোকজন, তাদের তৈরি সমাজ আগেও ছিল। রামমোহনের সময় ছিল। বিদ্যাসাগরের সময় ছিল। .. আমাদের সময়েও আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এতে পাত্তা দেয়নি। আমিও দেব না।

—ওহ, তুমি তাহলে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো কিছু একটা করতে চাইছ?

—আরে দুর! —হেসে ফেলে দেবদ্যুতি। ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরায়। তাপসীর দিকেও সিগারেট-প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে। একটা সিগারেট তুলে নেয় তাপসী। সিগারেট খাওয়া তাকে অভ্যেস করিয়েছে দেবদ্যুতিই। প্রথম প্রথম খুব কাশি হত। ভালো লাগত না সিগারেট টানতে। ক্রমে কীরকম ধূমপানে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে সে। তবে প্রকাশ্যে সিগারেট টানে না তাপসী। বাড়িতে দেবদ্যুতির সঙ্গে একত্রে ধূমপান করে। সারাদিন বড়জোর দুটো।

—শোনো তাপসী সোশ্যাল রিফর্মার হবার কোনও বাসনা আমার নেই। জীবনের শুরু থেকেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম কতকগুলো বিষয়ে আমার কোনও আগ্রহ থাকবে না। —এটুকু বলে থামে দেবদ্যুতি। ভাবতে থাকে।

—কী কী বিষয়?

—যেমন ধরো রাজনীতি। আমি কোনওদিন পোলিটিসিয়ান হতে চাই না। কারণ তাহলে সকাল বিকেল মিথ্যে বলতে হবে। নিজেকে ঠকাতে হবে। সেল্ফ-ডিসেপসনকে আমি সবথেকে হেট করি।...লেখক হতে চাইনি কোনওদিন। খেলোয়াড় হতে চাইনি। সমাজ-সংস্কারক হতেও চাইনি। রিফর্মেশনে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। আমি বিশ্বাস করি মানুষকে রিফর্ম করা যায় না। সমাজকেও না। যারা এসব বলে তারা হয় বোকা আর না হলে চরম ধান্দাবাজ।

—রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে তাহলে তুমি বোকা কিংবা ধান্দাবাজ ভাবো?

—নেভার নেভার। .... দে ওয়্যার গ্রেট মেন। সত্যিই সমাজে কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল হয়তো। কিন্তু আলটিমেটলি সমাজ কি পালটেছে এতটুকু? সতীদাহ কি এখনও হয় না?... আর বিধবাকে কি আজও কেউ স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চায়?

—লেখক হতে চাও না তাহলে যে অতো মোটা মোটা পত্রিকা বের করছ?

--বেলা অবেলা-র কথা বলছ? তুমি তো আসলে কিছু পড়ো না, তাই বলছ। আমার পত্রিকাতে সম্পাদকীয় ছাড়া আমি কিছু লিখিনি। কোনওদিন লিখবও না। লেখকেরা আমার পত্রিকাতে লেখে। তাদের অনেককে একটা প্লাটফর্মে আনা। এই কাজটাতে আমি বেশ আনন্দ পাই।....লেখকদের কি শুধু লিখলেই হয় নাকি? পরিশ্রম করতে হয়। মুটে মজুরের মতো পরিশ্রম। তার সঙ্গে ক্যালকুলেশান করে চলা আছে। ধান্ধাবাজি আছে। এসব না করতে পারলে লেখক হিসেবে কল্কে পাওয়া সোজা নয়। আমি অতো পরিশ্রম করতে পারব না। ধান্দাবাজিও না। আমার কোনও অ্যামবিশান নেই তাপসী। আমি কিছু হতে চাই না। আমি শুধু দেখতে চাই। অন্যের জীবনকে। আমার জীবনকেও। নিজের জীবনকে দূর থেকে দেখা। ব্যাপারটা কীরকম বলো তো তাপসী?...ইয়েস আই অ্যাম আ সিয়ার...আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু লুক অ্যাট মাই ওন লাইফ্... ফ্রম আ ডিসট্যান্স...।

এসব কথা যখন বলে দেবদ্যুতি তখন তাপসীর মাথায় কিচ্ছুই ঢোকে না। সবকিছু হেঁয়ালির মতো মনে হয়। হেঁয়ালি কিংবা রগড়। রগড়? হ্যাঁ রগড়ই তো। দেবদ্যুতির শিক্ষিত রগড়। তাপসী অতো শিক্ষিত নয়। সারাদিন হয়তো সে খবরের কাগজটাই খুঁটিয়ে পড়তে আগ্রহ পায় না। তার প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র দৈহিক জীবনযাপনকে ঘিরে। জীবন বলতে সে বোঝে খেতে-পরতে পাওয়ার নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তাবোধ, মাথার ওপর শক্তপোক্ত ছাদ, পায়ের নীচে শক্ত মাটি। ঝড়-ঝাপটা তাকেও তো কম সামলাতে হয়নি। অশ্বিনী তার জীবনটাকে নানারকম অন্ধকারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রবল ঝড়ের মুখে বেসামাল তাঁবুর মতো লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে তার জীবন অশ্বিনী। তার হাত থেকে কি নিস্তার আছে? এখনও সে লেগে আছে তাপসীর পেছনে ফেউয়ের মতো।...শয়তান কাঁহীকা...!

—তুমি আমার সঙ্গে লিভ-টুগেদার করতে চাইছ। সাহেব মেমরা যেরকম করে। আবার এটাও তো সত্যি যে সাহেব মেমরা কথায় কথায় পার্টনার পালটায়। তুমিও হয়তো তাই করবে। যখন ভালো লাগবে না আমাকে, আমার শরীরটা পুরনো হয়ে যাবে, তখন কী হবে? তখন যদি তুমি আমাকে পালটাতে চাও?

তাপসীর এরকম কথায় দেবদ্যুতি রাগ দেখায় না। তাকে আশঙ্কা থেকে আশ্বস্ত করতেও চায় না সেভাবে। শুধু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—সেটাই তো আমার পরীক্ষা। আমার এক্সপেরিমেন্ট। বিয়ে না করেও একজন মেয়ের সঙ্গে সারাজীবন থাকা সম্ভব কিনা, তাকে সারাজীবন ভালোবাসা যায় কিনা...।

—ভালোবাসা? তাপসী মুখ টিপে হাসে।—তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?

—তোমার কী মনে হয়?

—আমার শরীরকে ভালোবাসো হয়তো। আমাকে ভালোবাসো না। এসব মেয়েরা বুঝতে পারে।

এরকম যখন বলে তাপসী তখনও দেবদ্যুতি আপত্তি জানিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠে না। কোনও নাটকীয়তার তেমন প্রশ্রয় নেই তার স্বভাবে। আবার ভাবতে থাকে দেবদ্যুতি। ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরিয়ে নেয় হয়তো। তারপর বিষণ্ণ হেসে বলে—সেটাও তো বুঝতে চাইছি সারাজীবন...।

—কী বুঝতে চাইছ?

—ঐ তোমরা যাকে ভালোবাসা বলো সেটা আসলে কী...।

ঠিকমতো বলতে গেলে অশ্বিনীকে এড়াতেই এতক্ষণ শাড়ির দোকানে টালবাহানা চলল তাপসীর। তাই শুধু কিছু বালুচরী শাড়ি দেখতে চেয়ে, দোকানের কর্মচারীকে অকারণ পরিশ্রম করিয়ে চলে যেতে খারাপ লাগছিল। বিশেষত দোকানে যখন খদ্দেরের সমাগমও খুব কম। খুব কম কেন? একেবারে নেই বললেই চলে। প্রায় আধঘণ্টার মতো হতে চলল তাপসীর দোকানের ভিতরে। কিন্তু সে ছাড়া অন্য কোনও খদ্দেরকে তো ঢুকতে দেখল না দোকানে? সুতরাং তাপসীর মনে হল, কিছু একটা না কিনলে খারাপ লাগবে তার। বেশ অস্বস্তিও হচ্ছিল।

—আগুন-রং বালুচরীটা দিয়ে দিই দিদি?

—নাহ ভাই। আজ বালুচরী থাক। আমি বরং একটা ঘরে পরার তাঁতের শাড়ি কিনি এখন। ঐ শাড়িটা দেখান তো?...আলমারির এক দিকে আঙুল দেখায় তাপসী।

হলুদ রং শাড়িটার। জমিটাও খারাপ নয়। ভেতরে বুটিও আছে ছোট ছোট। চারশ টাকা দিয়ে সেই শাড়িটাই নিয়ে নিল তাপসী। কিছু না কিনে দোকান থেকে চলে আসার অস্বস্তি থেকে বাঁচল। ক্যাশবাক্সের সামনে যে লোকটা বসেছিল, যাকে দোকানের মালিক বলে অনুমান হয়েছিল তাপসীর, (হয়তো তাই), সে বলল—দিদি

বালুচরীগুলো দেখে গেলেন যখন একদিন কিনতে আসবেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ... দেখা যাক।

—আসবেন। কম করে দেব।

শাড়ির প্যাকেটটা বিগ শপারেই গুঁজে নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছে গেল তাপসী। একটা সাধারণ কিন্তু সুন্দর বিকেল। আকাশ পরিষ্কার। গরমের অনুভব কম। চারদিকে জীবনের মায়াময় কলরোল। তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের তালা খুলতে মুখ ঝুঁকিয়েছে তাপসী; সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছে। তিনতলাতেই তো আসছে। কে? মুখ ঘুরিয়ে তাপসী দেখল অশ্বিনী। তার মুখে মিটমিটে হাসি।...

পাঁচ

অশ্বিনীকে চোখের সামনে দেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে গেল তাপসীর। এক মুহূর্ত তার মনে হল, ফ্ল্যাটের দরজার চাবি সে খুলবে না। এই সিঁড়িব মাথা থেকেই বিদেয় করবে বদমাশ, নেই—আঁকড়া লোকটাকে। ওকে প্রশ্রয় দেবার কোনও কারণ নেই। তাপসীর জীবনে অনেক ক্ষতি করেছে অশ্বিনী এই ক-বছর ধরে। ওর ছায়া মাড়ানো মানেই নিজের জীবনকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলা। ওকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

—আবার পিছু নিয়েছ কেন?..কী মতলব?

—আহা এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে? নাকি ভেতরে একটু বসতে বলবে?—অশ্বিনী বাঁকা হাসল। চোরা চোখে তাপসীর হাতে শাড়িটার প্যাকেটের দিকে তাকাল।—নতুন শাড়ি কেনা হল বুঝি?...তা বেশ।...আবার হাসল। অশ্বিনীর এই হাসি দেখলেই বুকের ভেতরটা কীরকম যেন কেঁপে ওঠে তাপসীর। আসলে অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই বুক কেঁপে ওঠে।

—আমি তোমাকে আজ ঢুকতে দেব না এ বাড়িতে। দরজার তালা খুলব না আমি।— রেগেমেগে তাপসী বলল।

—তাহলেও আমি কিন্তু যাব না।—অশ্বিনী আবার নিজের শয়তানি হাসিটা হাসল।—আমি জানি অটো থেকে তুমি আমাকে ঠিকই দেখতে পেয়েছ। আবার এটাও জানি আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যেই তুমি সাত-তাড়াতাড়ি স্টপেজের আগে নেমে পড়ে সামনের মার্কেটে ঢুকে গেলে। কিন্তু আমাকে কি এড়াতে পারলে? রাস্তার উলটো দিকের চায়ের দোকানটাতে ঢুকে পড়তে হল আমাকে। গাঁটের কড়ি খরচা করে চা নিতে হল দু-বার। একবার বিস্কুটও নিতে হল। শুধু এক কাপ চা নিয়ে কি চল্লিশ মিনিট বসে থাকা যায়?...হ্যাঁ আমি হাতের ঘড়ি দেখেছি। পাক্কা চল্লিশ মিনিট তুমি মার্কেটে ঘুরেছ। অবশ্য মেয়েরা মার্কেটে ঘুরতে পছন্দ করে...।

—কী চাও তুমি বলো তো?...টাকা? এই তো সেদিন টাকা নিয়ে গেলে?

—এই তো সেদিন কী গো? তিন উইক হয়ে গেলো। মাত্র চারশটি টাকা তো দিয়েছিলে? একুশ দিন চারশ টাকায় চলে?

—কেন এখন রোজগারপাতি বন্ধ হয়ে গেছে? দালালির কাজ, দু-নম্বরি ব্যবসা এসব তেমন জমছে না বুঝি?

—যেসব কাজ-কারবার করি তাকে দু-নম্বরি বলচ বলো,...কিন্তু সেগুলো ঠিক

দু-নম্বরি নয়। আর তাছাড়া আজকালকার বাজারে কে দু-নম্বরি নয় বলো তো? সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কটা আছে? তুমি দেকাতে পারবে?

অশ্বিনীর কথার উত্তরে তাপসী রেগেমেগে আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নীচের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সামলে নিল নিজেকে।...কারা আসছে? চারতলাতে যারা থাকে তারা? প্রতি ফ্লোরে যেমন, চারতলাতেও দুটো ফ্ল্যাট, দুটো ফ্যামিলি থাকে। তাদের কারোর সঙ্গেই তেমন আলাপ নেই তাপসীর। বস্তুত, এই আবাসনের কোনও বাসিন্দাই তার সঙ্গে কথা বলে না। কেনই বা বলবে? সবাই বোধহয় সব বোঝে। সে যে দেবদ্যুতির বিয়ে-করা বউ নয় এই আবাসনের প্রত্যেকেই বোধহয় সেটা জানে। আর জানবে নাই বা কেন? এসব খবর কি চাপা থাকে? এ-ফ্ল্যাটে ও-ফ্ল্যাটে যেসব মেয়েরা পরিচারিকার কাজ করে; তাদের মতো সক্রিয় সংবাদ-বাহকের মাধ্যমে এসব গোপন খবর ঠিক পড়শীদের কানে পৌঁছে যায়। উঠে আসছে... উঠে আসছে... দু-জোড়া পায়ের শব্দ এখন এই সিঁড়ির মাথাতে পৌঁছে গেছে। চারতলার ডানদিকের ফ্ল্যাটের মহিলা আর তার মেয়ে। মহিলা যথেষ্ট সুন্দরী। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। সাজগোজে এই শহরের উৎকৃষ্ট আধুনিকা। মেয়ের বয়স বারো-তেরো হবে। মেয়েকেও দেখতে বেশ। স্কুলের পোশাক। ওরা দুজনেই বেশ অস্বস্তির সঙ্গে তাকাল প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা তাপসী আর অশ্বিনীর দিকে। মেয়েটার চোখে কৌতূহল। মায়ের চোখে বিরক্তি; একটু ঘৃণাও কি ফুটে উঠেছে?...ইস! একেই তাপসীকে খারাপ ভাবে এরা। এখন অশ্বিনীব সঙ্গে এখানে, বন্ধ ফ্ল্যাটের সামনে তাকে এরকম অসময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই মহিলা ভাবছে তাপসী বাড়িতে লোক ঢোকাচ্ছে।...কী লজ্জা! মহিলা সত্যিই এবার তীব্র ঘৃণার বিদ্যুৎ তাপসীর দিকে চকিতে হেনে অকারণেই মেয়েকে ডাকল—মালা, উঠে এসো তাড়াতাড়ি...দাঁড়াবে না...! এই কথাটা বলার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? মেয়ে তো মায়ের সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল। তাপসীকে সে দেখে বটে। হয়তো রোজই। কিন্তু বাক্যালাপ নেই। আলাপই হয়নি। সে তাপসীকে দেখে দাঁড়াতেই বা যাবে কেন? কিন্তু তবুও মেয়েকে বলা হল কথাটা। আসলে তাপসীর প্রতি চাপা ঘেন্নার ভাবটাই বোঝানো হল। বুঝিয়ে দেওয়া হল যে তাপসীর মতো 'খারাপ' মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে যাওয়া এখানকার 'সোসাইটির' পক্ষে স্বাস্থ্যকর বা সমীচীন কোনওটাই নয়। আবার রাগের ঝাঁঝ নিজের ভেতরে অনুভব করল তাপসী। রেগে সে অশ্বিনীকেই খারাপ কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেখল অশ্বিনী বেশ ঘামছে। এত ঘামছে যে পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-গলা মুছছে। তাপসী কিছু বলার আগেই অশ্বিনী বলল—এখন বেলা তিনটে। গুমোট গরম। এখানে আরও গুমোট। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কি ভালো দেখাচ্ছে? দরজার তালাটা খোলো না?

—নাহ খুলব না। তোমার টাকা দরকার টাকা দিচ্ছি। বিদেয় হও। বেশি টাকা

নেই অবশ্য। শ দুয়েক ব্যাগে আছে। এটা নিয়ে কেটে পড়ো। --ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল তাপসী। তার আগেই অশ্বিনী ভেংচি কেটে বলল—ইল্লি আর কি? শালা নিজের বউয়ের কাছে এসেছি বাড়ির দোরগোড়া থেকে চলে যাব বলে? একটু আদর-সোহাগ খাব না? দরজা খোল বলছি ? তা না হলে তোর নাগরটাকে ফোন করব আজকেই। সব হিস্টিরি চেঁচে-পুঁচে বলে দেব শ্লা...। তুই যে আমার বিয়ে করা বউ। এখনও তাই আচিস এটা নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের অফিসার-বাবু জানে না? তুই বলতে পারবি না জানি। এঁটো মাগীকে কার ভালো লাগে? .... কেন আমাকে রাগাচ্চিস ভাই? চুদুর-বুদুর করলে জানিস তো খারাপ কাজ আমি সব করতে পারি? ... খোল বে দরজা খোল! আর দাঁড় করিয়ে রাখিসনি....।

এই হলো আসল অশ্বিনীর কিছুটা। তাপসী সভয়ে দেখছিল কথাগুলো বলার সময় অশ্বিনীর মুখের সেই মোলায়েম ভাব একেবারে উধাও। সেই ওরিজিনাল হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে অশ্বিনীর রোগাটে, হতশ্রী মুখে। এখন তাকে দেখে আবার তাপসীর মনে হচ্ছে অশ্বিনী যথার্থই শয়তানের অনুচর। যে শয়তান এতদিন ধরে তাপসীকে নির্দয়ভাবে ডোমিনেট করে আসছে। এখনও কতদিন তা করবে তাপসী জানে না। এর শেষ কোথায় তাপসী জানে না। ভয়ে তার বুক কাঁপে। নীচের সিঁড়িতে আবার যেন কার পায়ের শব্দ। বিকেল হতে চলেছে। কাজের মেয়েরা এবার এসে যাবে বাড়িতে বাড়িতে। এঁটো বাসন, ঘরের মেঝের ধুলো-বালি এই আবাসনের সব বাড়িতেই অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। তাপসীদের ফ্ল্যাটেও ঠিক এই সময়েই কাজের মেয়েটা আসে। কিন্তু কী ভাগ্যি এবেলা সে আজ আসবে না। তার 'স্বামী'-র শরীর নাকি খারাপ। ওদের তো ওসব লেগেই আছে। নতুন কিছু নয়। বরং আজ যে এবেলা আসবে না তাতে ভালোই। মেয়েটা এখনও অশ্বিনীকে দেখেনি। দেখলে বিপদই ছিল। আর বিন্দুমাত্র কথা না বাড়িয়ে তাপসী চাবি লাগিয়ে দরজার তালা খুলল। দরজা খুলে ধরে অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল—ভেতরে এসো। ফ্ল্যাটের মধ্যে অশ্বিনী ঢুকে আসতেই তাপসী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। সিঁড়ি দিয়ে যে উঠে আসছিল যে এখন বন্ধ দরজার সামনে। আই-হোলে চোখ দিয়ে তাপসী দেখল তার অনুমানই ঠিক। চারতলার মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাটে এই মাঝবয়সী মহিলাই কাজ করে। পারলারের ছোট সাইজের, চৌকোপানা কার্পেটের ওপরেই অশ্বিনী নিজের জিলিপি-হয়ে-যাওয়া কাবলী জুতোদুটো ছেতরে খুলে রেখে গেছে। তাপসী পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে জুতোদুটোকে কার্পেট থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। জুতোর র‍্যাকের সামনে রেখে দিল। চোখ কুঁচকে দেখল, কার্পেটে ধুলো-টুলো লেগেছে কিনা। যদিও দেবদ্যুতি সব সময়েই নিজের খেয়ালে থাকে, চারপাশে তেমন নজর করে না; তবুও কার্পেটের নেভি-ব্লু জমিতে ধুলো বা কাদার চিহ্ন দেখলে তার মনে যদি কোনও সন্দেহ হয়। যদি সে তাপসীকে জিজ্ঞেস করে—বাড়িতে কেউ এসেছিল? তাহলে তো আবার সেই মিথ্যে

বলতে হবে। মিথ্যে যত কম বলা যায়। যদিও তার, তাপসীর, জীবনটাই তো এখন অজস্র মিথ্যে দিয়ে বানানো। এখন ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। কার্পেটে ধুলো-কাদা ছিল না। তাও সে কয়েকবার ফুলঝাড়ুটা বুলিয়ে দিল ওখানে। তারপর হাতটা বেসিনে ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে ঘরে এসে দেখল, ফুলস্পিডে পাখা চলছে। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে অশ্বিনী।

ছয়

অশ্বিনীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে তাপসীর একমুহূর্ত মনে হল সত্যিই লোকটা খুব ক্লান্ত। প্রথমে আজ যখন দেখেছিল তখন অতটা মনে হয়নি। এখন চকিতে মনে হল, আগের থেকে যেন বেশ রোগাও হয়ে গেছে অশ্বিনী। মুখটা শুকনো আর তেকোণা লাগছে আরও। গালে আর চিবুকে বকুলফুলের মতো না-কামানো দাড়ি। চোখের কোল বসে গেছে। চোখের কোণে কালি। আর মাথাতে তো কোনওদিনই তেমন চুল ছিল না অশ্বিনীর। সেই প্রথম আলাপের সময় কিংবা বিয়ের সময় থেকে দেখছে। অনেকের টাক শুরু হয় মাথার পেছনদিক থেকে। প্রথমে চাঁদির কাছটা চুল ক্রমশ উঠে ফাঁকা আর গোল মতো হয়ে যায়। তারপর আশপাশ থেকে চুল পড়তে শুরু করে। কিন্তু অশ্বিনীর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক তার উলটোটাই। মাথার সামনের দিকের চুল উঠতে উঠতে কপালটাই ক্রমশ মালভূমির মতো ফাঁকা আর চকচকে হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখন তো মাথা জুড়ে পুরোপুরি টাকই অশ্বিনীর। প্রকৃত টাকলু মানুষদের ক্ষেত্রে যেরকম হয়ে থাকে অশ্বিনীরও তাই। সামনের দিকে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু মাথার পেছনদিকে কিছু চুল। যা পাখার বাতাসে তিরতির ওড়ে। এখনও উড়ছে। অশ্বিনী একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে বলেই দেখতে পাচ্ছে তাপসী। দেখতে দেখতে তার হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। তখন তুমুল প্রেম চলছিল তাপসীর অশ্বিনীর সঙ্গে। যেমন অনেক মেয়ে অনেক পুরুষকে ভুল বোঝে, তেমনই তাপসীও আবেগের প্রথম ধাক্কায় অশ্বিনীকে ভুল বুঝেছিল। লোকটা যে আসলে একজন ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর, ঠগবাজ, প্রতারক তা আদৌ বোঝেনি। তখন থেকেই অশ্বিনীর মাথার সামনের দিকের চুল রীতিমতো উঠতে শুরু করেছে। একদিন হাসতে হাসতে তাপসী জানতে চেয়েছিল—অনেকের মাথাতেই তো টাক পড়ে। তাদের এরকম হয় না। তোমারটা এরকম কেন?

—কীরকম? —অশ্বিনী বলেছিল।

—অনেকেরই টাক পড়ে দেখি পেছন দিক থেকে। তোমারটা শুরু হচ্ছে সামনের দিক থেকে। সামনের দিকের চুল উঠে কপাল মাঠের মতো হয়ে গেলে বিশ্রি লাগে না?

—আরে দর্শনে কী যায় আসে? আমি মানুষটা তো খারাপ নয়। তাছাড়া ... থেমে গিয়েছিল অশ্বিনী।

—কী তাছাড়া? —তাপসী আবার জিজ্ঞেস করেছিল।

—যাদের মাথার পেছনদিকে টাক পড়ে, তারা সব সুখী মানুষ। পেছন থেকে তাদের টাক কীরকম চকচক করে। ঐ টাককে লোকে বলে সুখ টাক। আর যাদের মাথার চুল সামনের দিক থেকে পড়তে শুরু করে সেই টাককে বলে দুখ-টাক। আমার মতো দুঃখী মানুষের তো দুখ-টাকই হবে।

কতদিন আগেকার কথা। আজ হঠাৎ মনে পড়ল। অথচ মনে করতে চায়নি তাপসী। অশ্বিনীর সঙ্গে একসময়ের যৌথ জীবনের যাবতীয় স্মৃতিকে সে ভুলে থাকতে চায়। জীবনে একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে অশ্বিনীর মতো শয়তান মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলে। মাত্র এই একটাই ভুল বোধহয় তাপসী করে ফেলেছিল। আর সেই একটা ভুলেই তাপসীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। জীবনে কত দুঃখ, শোক, পাপ আর অপরাধ জমে গেছে। তার একমাত্র কারণ হল অশ্বিনী। নিজের খরচ হয়ে যাওয়া ফর্দাফাঁই সেই জীবনকে আর বোধহয় ঠিক করা যাবে না। মিথ্যেই আরও ঘনীভূত হবে তাপসীর জীবনে। তাকে ঠকাতে হবে মানুষকে। সত্য গোপন করে যেতে হবে। যেমন এখন করতে হচ্ছে তাকে। সত্য গোপন করে, নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে সে দেবদ্যুতির মতো বিদ্যান এবং বিশুদ্ধ মানুষের জীবনকে বোধহয় নোংরা করে দিচ্ছে। আর এসবের জন্যে যে দায়ী সেই অশ্বিনী ঐ শুয়ে আছে এ-ঘরের সিঙ্গল খাটে। তাপসীর বিছানায়। অশ্বিনীর ক্ষয়াটে চেহার দেখে যে করুণার ভাবের উদয় হয়েছিল তাপসীর মনে মুহূর্তের জন্যে; তা উধাও হয়ে গিয়ে জায়গা নিল রাগ। তার জীবনকে নষ্ট করার জন্যে দায়ী যে লোকটা, তাকে সে নিজের বিছানায় পারিপাটি করে শুতে দেবে? কখনোইনা....।

—কী মতলবে এসেছো বলো তো? ... এভাবে কতদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে আমাকে? —তীক্ষ্ণ স্বরে তাপসী বলল। অশ্বিনী এতক্ষণ চোখ বুজে শুয়েছিল। মাথার ওপর পূর্ণগতিতে ঘুরছে ফ্যান। এ-ঘরে ঢুকে অশ্বিনী নিজেই 'অন' করে নিয়েছে ফ্যানের সুইচ। রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফুল-স্পিড করে নিয়েছে। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহ বাইরে। ফ্যানের হাওয়ায় শুলে আরাম হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণেই বোধহয় অশ্বিনীর চোখ দুটোও কিঞ্চিৎ জড়িয়ে এসেছিল। তাপসীর তীক্ষ্ণ স্বরে তার সম্বিৎ ফিরল। চোখ খুলে পিটপিট করে দেখল সে। তারপর রাগে থমথমে তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—বাইরে কী গরম পড়েচে বলো তো? একটু শুতে পেরে সত্যিই আরাম লাগচে।

—হ্যাঁ আদিখ্যেতা খুব হয়েচে। এখন ওঠো। উঠে পড় চটপট। কোনও নকশাতে ভুলচি না। উনি আবার আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন।

—উনি মানে? ... তোমার লেটেস্ট নাগরের কথা বলচ?

—একেবারে বাজে কথা বলবে না ... আগুন-চোখে তাপসী তাকাল। —তোমার মতো ছোটলোকের মুখে দেববাবুর মতো ভদ্দরলোকের সম্বন্ধে বাজে কথা আমি অ্যালাও করব না।

—বাব্‌বা রস তো বড় উথলে উঠচে গো? —একটু কাচে এস্‌সো না ... একটা হামি দাও—।

—এবার মুড়ো ঝাঁটা এনে মুকে ভাঙব!

—ওরকম বদ মেজাজ দেকাচ্চ কেন? আমি তো এখনও তোমার বিয়ে করা স্বামী না কি? ডিভোর্স তো এখনও হয়নি আমাদের?

—ও বিয়ে আমি মানি না। কেউ মানবে না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়ে ফুসলে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে তোমার চেনা পাণ্ডার সামনে আমার মাথায় সিঁদুর দিয়েছিলে। ওটাকে বিয়ে বলে? ও বিয়ে তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।

—তাই নাকি? —যেন শরীরে ভীমরুল আচমকা হুল বসিয়েছে, এভাবে তড়াক করে অশ্বিনী বিছানায় উঠে বসল। —তাই নাকি? আজ এই কতা বলচ? জল দেকচি অনেকদূর গড়িয়েচে? রাধার মুকে কতা ফুটেচে! কালীঘাটের বিয়েকে তুমি বিয়ে বলে মানো না? এই কতা তো? এটা কি চ্যালেঞ্জ? —মুহূর্তে অশ্বিনীর মুখ-চোখ পালটে গেছে। ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে। —তাহলে আমি যাই? শেষের এই কথাটায় তাপসীর বুক কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল ভুল করে ফেলেছে। ...ওকী! সত্যিই অশ্বিনী বিছানা ছেড়ে ঝাঁ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—তাহলে তুমি তোমার এত সুন্দর সাজানো সংসার আর দেববাবুর মতো নাগরকে নিয়ে থাকো। আমি চললুম। শুদু শুদু ভদ্দরলোকদের আর ডিসটাব করি কেন? —কথা বলতে বলতে অশ্বিনী সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে পারলারে এসেছে। নিজের খাজা হয়ে যাওয়া জুতো-জোড়াতে পা গলাচ্ছে। এবার তাপসী সত্যিই ভয় পেয়েছে। এতক্ষণ যে ভয়ের কথা তার মনে ছিল না। অশ্বিনীর ব্যাপারে যে ভয় নিয়ে তার মাঝে মাঝে রাত-জাগাও হয়ে যায়। দেবদ্যুতির নিরাপদ আশ্রয়ে, প্রাচুর্যের মাঝে, নরম বিছানায় শুয়েও সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। যদি অশ্বিনী সব সত্যিগুলো দেবদ্যুতির কানে তুলে দেয়? যদি দেবদ্যুতির কাছে প্রমাণিত হয় যে সে ডাহা মিথ্যেবাদী? নিজের আসল পরিচয় গোপন করে তাপসী দেবদ্যুতির এই সংসারে ঢুকেছিল। তারপর গেড়ে বসেছে সেখানে। ... আজ অশ্বিনীকে এভাবে চলে যেতে দেওয়া যায় না। তার কথার ধাঁচ আর শরীরের ভাষা থেকেই তাপসী বুঝতে পারছে যে, সে অশ্বিনীর মোক্ষম জায়গায় আঘাত করে ফেলেছে। বিষাক্ত সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেছে তাপসী। সেই সাপ এখন ফণা তুলেছে। ছোবল দিতে পারে। ...দেবদ্যুতিকে সবকিছু জানাতে পারে অশ্বিনী। আজই। কিংবা আগামীকাল। কীভাবে জানাবে? ফোন করবে? নাকি চিঠি লিখবে? চিঠি-ফিটি লেখার পরিশ্রমে হয়তো নাও যেতে পারে অশ্বিনী। দু লাইন লিখতে তার কলম ভেঙে যেতে পারে। একটা বাক্য লিখলে হয়তো পাঁচটা বানান ভুল করে বসবে প্রায়-মুখ্যু অশ্বিনী। তাহলে নিশ্চয়ই ফোনেই বলবে। আগামীকাল অফিসে বসে কাজ করতে করতে আচমকা একটা ফোন পাবে দেবদ্যুতি। অচেনা গলার একটা ফোন।

সে প্রথমে জানতে চাইবে কে কথা বলছে। অশ্বিনী নিজের পরিচয় দেবে না হয়তো। শুধু সংক্ষেপে বলবে—আপনার সঙ্গে একটু কতা ছিল ...। —কী কথা? —দেবদ্যুতি জানতে চাইবে। —এই একটু কতা ...। —অশ্বিনী হেঁয়ালি করবে। —কী কথা বলুন না? —অধৈর্য স্বরে দেবদ্যুতি হয়তো একটু ধমকে উঠবে। —তাপসী বলে যে মেয়েটার সঙ্গে আপনি লিভ-টুগেদার করচেন, বেমক্কা ফূর্তি মারচেন তার সম্বন্ধে কিছু কতা। নিজের আসল পরিচয় সে তো আপনাকে বলেনি। আপনার মাকেও বলেনি। আপনাদের দুজনকেই মিথ্যে বলেছিল। সে আপনাদের বলেছে যে সে অবিবাহিতা। কিন্তু তা নয় ... তা নয়। সে বিবাহিতা। এই তো আমি তার হাজবান্ড ...।

মাথা ঘুরছিল তাপসীর। চোখের সামনে নীল দেয়ালের আয়তক্ষেত্র ঘুরতে শুরু করেছিল। কাঁপতে কাঁপতে তাপসী দেখল অশ্বিনী নিজের জুতোজোড়াতে পা গলিয়ে ফেলেছে। এবার বোধহয় দরজা খুলবে। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না তাপসী। সে ছুটে গেল অশ্বিনীর দিকে। এতক্ষণ যা সে করার কথা আদৌ ভাবেনি, এখন তাই করল। নিজের দু-হাত দিয়ে অশ্বিনীর রোগা আর ফেঁসফেঁসে চামড়ার তীক্ষ্ণ হাতদুটো ধরে বলল—ওগো রাগ কোরো না। মাথার ঠিক ছিল না কী বলতে কী বলে ফেলেচি! তুমি এখন যেয়ো না। একটু বিশ্রাম নাও। চা করি। পরোটা ভেজে দিই কয়েকটা। ওগো তুমি রাগ কোরো না ...! —তাপসীর স্বরে এখন ভেঙে পড়বার সজল আভাস। অশ্বিনী ফিরে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন সত্যিই ক্রূর, বিষধর সাপের চোখ। অশ্বিনীর সেই হাড়-হিম দৃষ্টি এই মুহূর্তে যেন তাপসীর মর্মের অন্দরটা দেখে নিতে চাইছে। অশ্বিনীর অ-সুন্দর মুখটাতে এখন ফুটে উঠেছে একধরনের ফিচেল হাসি। জুতোজোড়া থেকে পা তুলে নিয়ে অশ্বিনী আবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—এই তো কেমন লক্ষ্মী মেয়ের মতো লাগচে তোমাকে। এতক্ষণ অন্যরকম লাগছিল....।

—একটু রসিকতা করছিলুম তাও বোঝো না? সত্যিই দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছো তুমি। —বলতে বলতে তাপসী ঝাঁ করে অশ্বিনীর একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের সালোয়ার-কামিজে ঢাকা বুকে রাখল। —তোমার নিজেরই তো জিনিস সব—নেবে না? —হেসে বলল তাপসী। অশ্বিনী আবার ফিচেল হেসে তাপসীর ঢলো-ঢলো স্তনের উপত্যকা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল। বলল—পরোটার কতা বলতেই খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল যেন! ভাজো দেখি কয়েকটা ....।

সাত

তাপসী বুঝেছে অশ্বিনীর মেজাজ এখনও খিঁচড়ে আছে। তার মানে আশঙ্কা এখনও যায়নি। ঝোঁকের মাথায় এ কী মতিভ্রম হয়েছিল তার? অশ্বিনী হচ্ছে সত্যিই একটা ক্রুর সাপের মতো। জেনেশুনে কেউ কি সাপের লেজে পা রাখে?

ফিরে এসে আবার বিছানাতে এসে বসেছে অশ্বিনী। যদিও তার মুখের ভাব এখনও বেশ থমথমে। একটু আগের সেই হাসিহাসি ভাবটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ফিরে এসেই উধাও। সে বিছানাতেই আবার। তবে এবার আর লম্বা হয়ে শোয়নি। বিছানার একধারে উঁচু করে রাখা এবং রং-বেরং সুজনি দিয়ে ঢাকা বালিশের ডাঁই এর গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। ট্রাউজারের পকেট থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করল। আর ঠিক এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যেন তাপসী। প্রায় কোলের ওপর বসে পড়ল অশ্বিনীর। মাখো মাখো স্বরে বলল—নাহ তুমি এখন বিড়ি ধরাবে না। বড় উৎকট লাগে আমার বিড়ির গন্ধ!

—যাহ মাইরি। নেশার জিনিস কী করব?

—এখন বিড়ি ধরাতে দেব না আমি। আমাকে খাও না? আমি কি খুব পুরনো হয়ে গেচি? মনে ধরে না বুঝি এখন আমাকে? অন্য কাউকে পেয়ে গেচ বোধহয়? —বলতে বলতে তাপসীর আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। নিজের মুখটা অশ্বিনীর মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চকাস্ শব্দে একটা চুমু খেল। যদিও সেটা খারাপ লাগল খুবই তাপসীর। কোনওদিন ভালভাবে মুখ ধোয়ানা অশ্বিনী। তার ফলে মুখে কীরকম কটু গন্ধ। বরাবরই বেশ নোংরা টাইপের অশ্বিনী সে জানে। খুব ঘাম হয় অশ্বিনীর। অথচ সে কিছুতেই সাবান মাখে না। অন্তর্বাস মানে গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি অনেকদিন পরপর পালটায়। আর সবথেকে যেটা খারাপ, খাওয়া-দাওয়া করে মুখে জল দিয়ে ভালোভাবে কুলকুচি করে ধুয়ে নেবার অভ্যাস কোনওদিনই নেই অশ্বিনীর। ফলে তার মুখে বিশ্রি, কটু গন্ধ প্রায় সবসময়েই পাওয়া যায়। চুমুটা খেয়ে খুবই খারাপ লাগল তাপসীর। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে সে অন্য একরকম ঢং করে অশ্বিনীকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। তার কানের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—একটু হয়ে যাক না? জামা-প্যান্ট খুলে ফেলো। আমিও সব খুলছি। কোনও ভয় নেই। এখন দেববাবু আসবে না। আসবে অনেক রাতে। আর কাজের মেয়েটাও এবেলা ছুটি নিয়েচে। নিজের বিয়ে-করা স্বামীকে আমার বুঝি কিছু দিতে ইচ্ছে করে না?

কিন্তু আশ্চর্য! অশ্বিনীর আজ কোনও হেলদোল নেই। সে তাপসীর থেকে

একটু তফাতে সরে বসল। তারপর বিড়িটা ধরাবে না এটা মনস্থ করে বান্ডিলটা পকেটের মধ্যে আবার চালান করে দিয়ে বলল—পেটে খিদে থাকলে শরীরের খিদের কথা কি মনে আসে? তোমাকে বললুম দুটো পরোটা ভাজতে। তা না করে তুমি এখন আমাকে সেক্স বিলোতে চাইচ! ওসব করতে হবে না। কিছু দিতে হবে না আমাকে। আমি আপাতত তোমার ক্ষতি করব না। তুমি দেববাবুর সঙ্গে যেমন চালিয়ে যাচ্ছো চালিয়ে যাও। এটা তোমার অস্তিত্বের লড়াই আমি বুঝি। আমারও একধরনের লড়াই আছে। আমাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে। সেই বেঁচে থাকার রসদ নিতেই তো তোমার কাচে আসা। সেটা বোঝ না কেন?

—কত টাকা লাগবে বলো? —আহত তাপসী এতক্ষণে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে অশ্বিনীর কাছ থেকে। সে বুঝেছে অশ্বিনী ইচ্ছে করেই তাকে, বিশেষত তার শরীরকে ইগনোর করছে।

—আপাতত দু-হাজার দাও ....।

—দু-হাজার? এত টাকা পাবো কোত্থেকে? এই তো কিছুদিন আগে এসে চারশ টাকা নিয়ে গেলে?

—কিছুদিন আগে নয়। প্রায় হপ্তা তিন আগে।

—এখন কি তুমি উপায়-টুপায় কিছুই করচ না?

—করচি টুকটাক। আমার সেই বন্ধু হেমন্ত-যাকে তুমি হোটেলের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে—সেই প্রোমোটার, তার অফিসেই আচি। টুকটাক কাজ হয়। টাকাপয়সাও আসে। কিন্তু তাতে হয় না। কষ্ট করতে হয়। তা আমার এমন একজন শাঁসালো বউ থাকতে আমি কষ্ট করব কেন?

—থাকো কোথায়? ঘর ভাড়া দিতে হয়?

—হেমন্তর অফিসেই রাতে শুয়ে পড়ি। আমাকে পেয়ে ওরও নাইটগার্ডের খরচাটা বেঁচে গেছে। একা মানুষ আমি। তোমার মতো একজন বউ থাকতেও আমার কিছু নেই। একার জন্যে আর বাড়ি ভাড়া করব কেন?

—ঘরভাড়া লাগে না। কারোর দায়িত্ব নিতে হয় না। তাহলে কথায় কথায় তোমার এত টাকা লাগে কেন? তোমার ঐ বন্ধু—হেমন্তবাবু—মাস মাইনে কিছু একটা দেয় নিশ্চয়ই তোমাকে?

—এত কৈফিয়ত তোমাকে আমি দেব না। দু-হাজার টাকা চাইছি দেবে। —তীক্ষ্ণ স্বরে অশ্বিনী বলে। এই স্বর যে রীতিমতো বিপজ্জনক তা আর তাপসীর জানতে বাকি নেই।

—রোজ রোজ এত টাকা আমি কোথায় পাই বলো তো?

—কেন? দেববাবুর টাকার অভাব? অতবড় ব্যাঙ্কের অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার। প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাইনে। ... খপর কিছু রাখি না ভাবচ? তাপসী চুপ করে থাকে।

—এছাড়াও শোনো—অশ্বিনী বলে যায়;—দেববাবু কখন বাড়ি ফেরে তার খবরও আমি রাখি।

—তার খবরও রাখো?

—রাখি বৈকি। ... শুনে নাও কোনওদিনই ও সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে না। ... সন্ধে ছটা নাগাদ বের হয় অফিস থেকে। সেখান থেকে পত্রিকার অফিস—গণেশ অ্যাভিনিউ। ঘণ্টা দেড়েক থাকার পর প্রেস ক্লাব। তোমার নাগরটি বেশ লাইনের মাইরি। রেগুলার প্রেস ক্লাবে গিয়ে দু-পাত্তর না চড়ালে ওঁর আবার হয় না। তারপর বাড়ি ফিরে এসে পোষা মেয়েমানুষ তুমি তো আছোই। তোমাকে কোলবালিশ করে ঘুমিয়ে পড়তে কতক্ষণ? এরকম ভাগ্যও ওদের হয় শালা! কোথায় আমাদের তো হয় না? মাথার ওপর কেউ নেই। এক বুড়ি মা ছিল। সেও তো পটকে গেল। ব্যাঙ্কের অফিসার! হাতে শালা অগাধ টাকা। তোমার মতো মেড-সারভেন্ট কাম রক্ষিতাকে পুষচে। বেঁচে থাকতে হলে আর কী চাই গুরু?

—দেববাবুর এত খবর তুমি রাখো! তুমি কি ওঁকে ফলো কর নাকি রোজ? তোমার মতলবটা কী বলো তো?

—মতলব আর কী? বড় বড় মানুষদের খোঁজ আমাদের রাখতে হয়। কখন কী দরকারে লেগে যায়....। —কীরকম ফিচেল হেসে অশ্বিনী বলে। —ঠিক আছে নাও। এখন আর কতা বাড়িয়ো না। টাকাটা দাও দিকি। আমাকেও উঠতে হবে।

—দু-হাজার পারব না। পনেরোশ দিচ্ছি। অত টাকা আমার কাচে নেই।

—এই শোনো—বেগড়বাঁই করতে যেও না তো। ...তোমার হাতে টাকা নেই এটা আমাকে শালা বিশ্বাস করতে হবে? যা চেয়েচি তাই দাও। তা না হলে আবার দিন দশ বাদেই আসতে হবে। পুরো দু-হাজার দিলে কথা দিচ্ছি এক মাসের আগে এ-মুখো হব না।

কিছুতেই শুনল না অশ্বিনী। আকারে-ইঙ্গিতে রীতিমতো ভয় দেখাতে লাগল তাপসীকে। তাপসী কি চায় যে অশ্বিনী সব খুলে বলুক দেববাবুকে? তাপসীর আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক? দেবদ্যুতি আর তার মাকে এ বাড়িতে আসার গোড়াতেই তো সে নিজের ভুল পরিচয় দিয়েছিল। সে বলেছিল যে সে অবিবাহিত। কেন যে বলেছিল? অশ্বিনীর কথা কি তার তখন মনে ছিল না? অশ্বিনীর চরিত্র কি সে জানত না। তার কি একবারও মনে হয়নি যে, অশ্বিনী সারাজীবনে তার পিছু ছাড়বে না? একটা মিথ্যেকে কেন্দ্র করে তাকে ব্ল্যাকমেল করে যাবে এভাবে? এই মিথ্যের জীবন থেকে কবে মুক্তি পাবে তাপসী? কীভাবেই বা মুক্তি মিলবে? আচ্ছা, দেবদ্যুতিকে সব খুলে বললে হয় না? তাপসী যদি দেবদ্যুতিকে জানায় যে সে তাকে এবং তার মাকে প্রথমদিন মিথ্যে বলেছিল। সে আসলে বিবাহিতা। অশ্বিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল একদিন। সামাজিক অনুশাসন মেনে যেভাবে বিয়ে হয় সেভাবে হয়নি। সরকারি রেজিস্টারের অফিসে কাগজে সই করেও সে

বিয়ে হয়নি। তাপসীর সেই অভিশপ্ত বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটের মন্দিরে। খুব বেশি সাক্ষী নেই সেই বিয়ের। বছর সাত আগের কথা। কালীঘাটের যে পাণ্ডার সামনে অশ্বিনী প্রথম সিঁদুর লেপে দিয়েছিল তাপসীর সিঁথিতে সেই পাণ্ডাকে কি এতদিন পর খুঁজে পাওয়া যাবে? তবে হেমন্তবাবু নামের সেই জঘন্য লোকটা তো আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনী ইচ্ছে করলে একটা গোলমাল তো লাগিয়েই দিতে পারে। ওদের কাছে সব-জানার পর দেবদ্যুতি যদি তাড়িয়ে দেয় তাপসীকে? তাহলে সে কোথায় যাবে? দাদা আর বোনের সংসারে? হতেই পারে না। দাদার সামনে সে দাঁড়াতেই পারবে না। তাকে ঘেন্না করে দাদা। তার মুখ দেখতে চায় না। সেখানে গিয়ে কীভাবে থাকবে তাপসী? তাহলে কি অশ্বিনীর সঙ্গে থাকবে? ... প্রশ্নই আসে না। তাপসী যদি অশ্বিনীর সঙ্গে থাকতে শুরু করে তাহলে সে বউকে এক নিয়মিত বেশ্যা বানিয়ে ফেলবে। প্রতিদিন লোক আনবে তাপসীর কাছে। তার টাকা চুরি করে নেশাভাঙ করবে। প্রতিবাদ করলে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করবে। ... নাহ, প্রাণ থাকতে সেই নারকীয় জীবনকে মেনে নিতে পারবে না তাপসী। তাহলে কী করবে? দেবদ্যুতির এই আশ্রয় যদি হারায় সে তাহলে একা একা কীভাবে বাঁচবে? গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে কীভাবে? সামান্য মাধ্যমিক পাশ আর কবেকার এক নার্সিং-ট্রেনিং নেওয়া একজন মেয়ের জন্যে কী চাকরি অপেক্ষা করে আছে এই সমাজে? ...সুতরাং জীবনধারণের জন্যে নিজের শরীরকেই কি বিক্রি করতে হবে? ... অবশ্য শরীর বিক্রি করা তার কাছে আর নতুন কী? দেবদ্যুতির সঙ্গে গত দেড়বছর ধরে প্রতিদিনের যে জীবন তাপসীর, তাও তো তার দিক থেকে সেই শরীর বিক্রি করারই খেলা? তফাত একটাই। এই বাড়িতে থাকতে এসে শুধুমাত্র একজন পুরুষকেই তৃপ্ত করতে হয়। এই আশ্রয় চলে গেলে তাকে বাজারের বেশ্যা হয়ে যেতে হবে। প্রতিদিনই, প্রতিরাতেই নতুন নতুন, অচেনা পুরুষকে তৃপ্ত করতে হবে। সুতরাং ...

সুতরাং নিজের অস্তিত্বযাপনের স্বার্থেই অশ্বিনীকে রাগালে চলবে না। হাতে রাখতে হবে তাকে। সে নিজেই স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছে। এখন সেই স্বেচ্ছাকৃত জীবনের অসুস্থ কবল থেকে সহজে তার মুক্তি নেই। এভাবেই চলতে হবে। নিজের ভাগ্যে যে কী আছে সে কিছুই জানে না।

পাশের বড় বেডরুমে, যেখানে একটা ডাবল-বেড খাট, রাতে দেবদ্যুতি আর তাপসী পাশাপাশি প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতো শুয়ে থাকে, সেখানে বড়সড় স্টিলের আলমারিও আছে। সেই আলমারির চাবি দেবদ্যুতি নিজের কাছে রাখে না। আলমারিতেই তা ঝোলে। যদিও দেবদ্যুতির বিবাহিত স্ত্রী নয় তাপসী, তবুও তার মা মারা যাবার পর এই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে আকারে-ইঙ্গিতে তাপসীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। সংসারের খরচ হিসেবে মোটা একটা টাকা দেবদ্যুতি ঐ আলমারির লকারেই রাখে। তাপসীকে সে বলেই রেখেছে প্রয়োজনমতো

বাজার-দোকান করার টাকা সে যেন নিজেই আলমারি থেকে বের করে নেয়। নিজের হাতখরচের জন্যেও টাকা নেবার অধিকার আছে তাপসীর ঐ আলমারি থেকেই। আইনত বিয়েই হয়নি শুধু। এছাড়া দেবদ্যুতি তো তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যা থেকে তাপসীর কোনওদিনই মনে হয় না সে এ বাড়ির কাজের লোক, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় তার রক্ষিতা। হ্যাঁ ঠিকই। তাদের এই বানানো, যৌথ জীবনে তাপসী অনেক স্বাধীনতা ভোগ করে। যা থেকে মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছে করে তাপসীর, যে, সে বুঝি দেবদ্যুতির কাছে একজন স্ত্রীর সম্মানই পাচ্ছে। আচ্ছা দেবদ্যুতি কি তাকে ভালোবাসে? ঠিক বুঝতে পারে না তাপসী। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় তার শরীরকে শুধু নয়। তাকেও যেন ভালোবাসে দেবদ্যুতি। ভালোবাসা ছাড়া কোনও মহিলাকে কি এতটা জায়গা দিতে পারে কোনও পুরুষ তার সংসারে?

একটা খামে কুড়িটা একশ টাকার নোট ভরে অশ্বিনীর হাতে তুলে দিল তাপসী। পরোটা ভাজার সময় দিল না অশ্বিনী। টাকাটা পাওয়ার পরই হঠাৎ তার খুব তাড়া পড়ে গেল। তাকে যেতে হবে। জরুরি কাজ আছে। আর বসে থাকলে চলবে না। তবুও শুধু মুখে অশ্বিনীকে যেতে দিল না তাপসী। ফ্রিজ থেকে বের করে দিল মিষ্টি আর ঠাণ্ডা জল।

অশ্বিনীকে বিদেয় করে তাপসী ভাবতে বসল, দেবদ্যুতির গতিবিধির এত নাড়ি-নক্ষত্র জানল কীভাবে অশ্বিনী? সে কি দেবদুতির পেছনে লেগে আছে? তার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে? কিন্তু কেন? অশ্বিনীর মতলবটা কী? কীরকম এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তাপসীর। কেন অশ্বিনী দেবদ্যুতির এত খবর রাখে?

... ট্যাক্সি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে অশ্বিনী সাঁৎ করে ঢুকে গেল 'গে' বার-এ। এখানে সে প্রায়ই আসে। হাতে টাকা এলেই। এখানে এক একদিন বিশেষ বিশেষ মদ কিছুটা কনসেসনে পাওয়া যায়। খাবারও বেশ সস্তা। আজ অশ্বিনীর মনে বেশ ফুর্তি। পকেটে আছে অনেক টাকা।

আট

'বেলা-অবেলা' পত্রিকার অফিস গণেশ অ্যাভিনিউয়ে। দেবদ্যুতির ব্যাঙ্ক হল স্ট্র্যান্ড রোডে। অফিস ছুটির পর সে হেঁটেই যায় পত্রিকার অফিসে। হাঁটা আর তেমন হয় কোথায় আজকাল। শরীর আগের থেকে ভারী হয়ে যাচ্ছে একটু যেন মেদ জমছে কোমরের চারপাশে। তার কারণও আছে হয়তো। প্রথমত কায়িক পরিশ্রম তেমন করা হয় না। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত না হলেও সপ্তাহে অন্তত তিন-চারদিন প্রেস ক্লাবে যাওয়া এবং মদ্যপান। প্রেস ক্লাব সাধারণ অর্থে সাংবাদিকদের আড্ডা দেওয়া এবং পানভোজনের আদর্শ এক জায়গা। ময়দান অঞ্চলের প্রায় মাঝখানে একটা বেশ বড়সড় তাঁবু। যেমন এখানে অনেক ক্লাবেরও তাঁবু আছে। মাঝে মাঝে সন্ধের দিকে প্রসূন আসে। দেবদ্যুতির অনেক দিনের বন্ধু। সাংবাদিক। মোটামুটি পরিচিত এক সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। সিনিয়র রিপোর্টার। প্রসুনের পাল্লায় পড়ে প্রেস ক্লাবে প্রথম প্রথম যেতে হত দেবদ্যুতিকে। সে প্রায় বছর তিন আগের কথা। অনেকদিন বাদে কলেজের বন্ধু প্রসূনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রসূনের সঙ্গেই প্রথম প্রেস ক্লাবে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। এর আগে ঐ জায়গাতে যাওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি। প্রথম গিয়ে বেশ ভালোই লেগেছিল তার। বিশাল হলঘর। এককোণে টিভি চলছে। মদের গ্লাস হাতে কেউ কেউ খবর শুনছে টিভির পর্দায় কিংবা সিরিয়াল দেখছে। আর এককোণে ক্যারামবোর্ড ঘিরে অনেকের হৈ-চৈ, উত্তেজনা, উল্লাস। আর যারা এই দুটো কোনওটাতেই আগ্রহী নয়, তারা বসে গেছে হলঘরে চারপাশে ছড়ানো চৌকো টেবিলগুলো ঘিরে। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। চুমুক দিচ্ছে মদের গেলাসে।

সাংবাদিকদের জন্যে প্রেস-ক্লাবে বাজারের থেকে একটু সস্তায় মদ পাওয়া যায়। খাবারটাও এখানে বেশ সস্তা। শুধু সাংবাদিকরা কেন, তাদের সঙ্গে দু-একজন 'গেস্ট'-ও আসতে পারে। সামান্য গেস্ট-চার্জ দিতে হয়। প্রসূনের সঙ্গে কলেজ-জীবনের পর যোগাযোগ ছিল না সত্যিই বহুদিন। দেবদ্যুতির কাছে খবর ছিল, প্রসূন নাকি কলকাতাতেই নেই। গ্র্যাজুয়েশনের পর সে ভর্তি হয়েছিল জার্নালিজম কোর্সে। পাশ করার পর কোন একটা কাগজের অফার পেয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। প্রসূনকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দেবদ্যুতি। যদিও কলেজ-জীবনে তার সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তার সঙ্গেই। সেই বয়সে যে কাজগুলো করলে মনে হয় বেশ খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার করা হল, সমাজের চালু নিয়ম কিংবা অনুশাসনগুলো ভাঙাও হল বেশ, সেই কাজগুলো তো সে, দেবদ্যুতি একদা প্রসূনের পাল্লায় পড়েই করেছে। কলেজের সব ক্লাশ যে নিয়মিত করত তা নয়। প্রায়ই

ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে প্রসূন আর দেবদ্যুতি ঘুরে বেড়াত কলেজ স্ট্রিটের বই-বাজারে। বিশেষত পুরনো বইয়ের দোকানগুলোতে ঢুঁ মারত দুজনে। কত দুর্লভ বই কেনা হয়েছে তখন নামমাত্র দামে। ডস্তয়েভস্কির 'অপরাধ এবং শাস্তি'-র প্রায় নতুন এক সংস্করণ সে একবার কিনেছিল অনেক দরাদরি করে মাত্র দশ টাকায়। পেঙ্গুইন সংস্করণ। কফি-হাউসের পাশে রূপা-র বইয়ের দোকানে সে একবার খোঁজ নিয়ে জেনেছিল নতুন বইটার দাম একশ চল্লিশ টাকা। কোনও এক পাঠক বইটি কিনেছিল হয়তো নেহাতই ঝোঁকের মাথায়। উত্তেজক এক থ্রিলার পড়তে পারবে এই আশায়। তারপর বইটি পড়তে গিয়ে তার আশাভঙ্গ হয়েছিল। কেননা বইটি রহমানের বিখ্যাত পুরনো বইয়ের দোকান থেকে মাত্র দশটাকায় কিনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেবদ্যুতি দেখেছিল একেবারে শেষ পৃষ্ঠার নীচে বল-পয়েন্ট পেনে লেখা আছে—'এই বইটি ভুলেও পড়বেন না। অত্যন্ত বোরিং এবং বাজে বই।' বোঝাই গিয়েছিল যে হতভাগ্য পাঠকের হাতে বইটি পড়েছিল সে ফিওদর দস্তয়েভস্কির নামই শোনেনি। এটাও মনে পড়ে মাঝে মাঝে এখনও দেবদ্যুতির, যে বইটির শেষ পৃষ্ঠায় পাঠকের সেই 'উদ্ধৃতিযোগ্য' মতামত দেখার পর প্রসূন আশেপাশের পথচারীদের সচকিত করে হো-হো হেসে উঠেছিল এবং বলেছিল—চল এই নির্বোধ, গেঁড়ে পাঠকের নামে আজকের দিনটা সেলিব্রেট করি।

—সেলিব্রেট করবি? কীভাবে?

—নিজামে চল। বীফ-রোল খেয়েছিস ওখানকার?

—বীফ-রোল? .... দুস্ ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে গরুর মাংস খাবো? ভাবতেই পারি না ...।

—এসব কী বলছিস রে দেব? ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এসব নিয়ে মাথা ঘামাস নাকি তুই? আরে আমিও বদ্যির ছেলে। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু তো বটেই? তাতে হয়েছেটা কী? নিজামের বীফ-রোল-এর কোনও তুলনা হয়? শোন্ মনে ওসব সেকেলে ধ্যানধারণা রাখবি না। পৃথিবীতে যত সুস্বাদু খাবার আছে সুযোগ পেলেই টেস্ট করে দেখবি। সেটা বীফ হতে পারে। হ্যামও হতে পারে।

সেই প্রথম, কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়াকালীন গরুর মাংসের স্বাদ নিয়েছিল দেবদ্যুতি। প্রথমে খেতে বেশ অসুবিধাই হয়েছিল। যত রাজ্যের সংস্কার ভিড় করে এসেছিল মনে। তারপর খেতে খেতে তার মনে হয়েছিল বেশ সুস্বাদু তো! সেদিনের পর থেকে নিজাম-এর বীফ-রোল তার প্রিয় কিছু খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রসূনের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে অনেকরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল দেবদ্যুতির যা সত্যিই আশ্চর্যের মনে হয়েছিল সেই সময়। যেমন একবার দুজনে সন্ধে নামার পর কার্জন পার্কে বসে গল্প করছিল। সন্ধে বেশ গাঢ় হবার পর দেবদ্যুতি দেখেছিল অনেক মহিলার আবির্ভাব চারপাশে। আশেপাশে যারা ছড়িয়ে

ছিটিয়ে তাদের মতোই বসে ছিল, চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিল, চিনেবাদামের খোসা ছাড়াচ্ছিল; তাদের অনেকের কাছেই মহিলারা এক একজন এগিয়ে যাচ্ছে, কথা হচ্ছে ফিসফাস। দু-একজন মহিলার সঙ্গে কাউকে কাউকে চলে যেতেও দেখেছিল তারা। প্রসূন ফিসফিস করে বলেছিল—এরা সব প্রস। যাবি নাকি?

—কোথায় যাব? —চমকে উঠেছিল দেবদ্যুতি। —তোর মাথা খারাপ হল নাকি?

—কেন খারাপ কী? অন্তত দরদাম তো করা যায়? বলতে বলতে একজন মহিলা এগিয়ে এসেছিল অন্ধকারের আবছায়ায় বসে থাকা তাদের দুজনের দিকে। দূরে নিয়ন আলোয় সেজে ছিল কলকাতা। আকাশে অল্প চাঁদও ছিল। অস্পষ্ট আলোতে দেবদ্যুতি দেখেছিল সেই মহিলার মুখের ঘামে পাউডারের সাদা দৃশ্যমান; মোটা দুই ঠোঁটে দগদগে রক্তের মতো লাল লিপস্টিক। আর ঝাঁ-ঝাঁ গন্ধও নাকে ধেয়ে এসেছিল দেবদ্যুতির। বিশ্রি লেগেছিল চড়া গন্ধটা। তাদের দুজনের মুখের কাছাকাছি মুখ চকিতে নামিয়ে এনে মহিলা কীরকম হাস্কি স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল —যাবে নাকি গো নাগর?

প্রসূন জিজ্ঞেস করেছিল—কত?

—কত দিতে পারবে? দুজনই পরপর? না একজন? ভীষণ লজ্জা লাগছিল দেবদ্যুতির। ভয়ও পাচ্ছিল কীরকম। ভয়ে হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। কপালে ফুটে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে হচ্ছিল দেবদ্যুতির যে সে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু প্রসূনের ঘাবড়ে যাওয়ার কোনও লক্ষণই ছিল না। সে অকম্পিত স্বরে বেমালুম জানতে চেয়েছিল—আরে পার হেড কত লাগবে বল না?

—পার হেড? —মহিলা পিচিত করে কার্জন পার্কের বিবর্ণ ঘাসে পানের পিক ফেলেছিল। —তোমরা তো দুধের শিশু গো? আচ্ছা প্রত্যেকে না হয় পনেরো টাকা করে দেবে ...। চল না গো! চল! সারাদিন আজ খদ্দের জোটেনি। —বলতে বলতে হঠাৎই দেবদ্যুতির হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছিল মহিলা। খুব ভয় পেয়েছিল দেবদ্যুতি। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে (পায়ে শু ছিল) ছুটতে শুরু করেছিল ট্রামলাইনের দিকে।

—ওমা তোমার বন্ধু পাইলে যাচ্ছে গো? ওর বোধহয় দাঁড়ায় না। খিলখিল হেসে বলছিল মহিলা অকুতোভয় প্রসূনকে। শেষ পর্যন্ত সেদিন প্রসূনও সেই মহিলার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। খানিক বাদেই তাকে দেখতে পেয়েছিল দেবদ্যুতি। বাসস্টপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে প্রসূন বলেছিল—ওরকম ছুটে পালিয়ে এলি কেন? শালা সব বেশ্যাগুলোর কী হাসি মাইরি!

—কীরকম ঘেন্না করল আমার। —দেবদ্যুতি বলেছিল—কী আশ্চর্য না?

—কীসের আশ্চর্য? —প্রসূন জিজ্ঞেস করেছিল।

—মাত্র পনেরো টাকায় নারীমাংস পাওয়া যায়?

সেই প্রসূনের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎই, অনেকদিন বাদে। একদিন সন্ধের দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটছিল ধর্মতলার ফুটপাত দিয়ে। কোনও উদ্দেশ্য ছিল না সেই হাঁটার। এলোমেলো হাঁটা। তখন খুব খারাপ সময় চলছিল দেবদ্যুতির। আত্রেয়ী নামের সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও বিয়েটা হল না। আত্রেয়ী নিজেই সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল দেবদ্যুতির। ছোট এবং অপমানিত। যেন বিনা কারণে আত্রেয়ী নামের অচেনা মেয়েটির কাছ থেকে আঘাত এসেছিল তার জীবনে। ...হ্যাঁ তাই তো। সে তো আর সেভাবে নিজে থেকে আত্রেয়ীর পাণিপ্রার্থী হতে চায়নি। মা সম্বন্ধ এনেছিল ঠিকই। আত্রেয়ীকে একদিন দেখতে তাদের বাড়িও গিয়েছিল দেবদ্যুতি। তারপর যা ঘটল তার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

আত্রেয়ীর সঙ্গে বিয়েটা না হওয়া তার পক্ষে শুধু অপমান ছিল না; মানসিকভাবে সে ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। কিছুই ভালো লাগত না তখন। বই পড়তে ভালো লাগত না। চাকরি করতে ভালো লাগত না। মানুষের সঙ্গ ভালো লাগত না। কিন্তু তা বলে সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পড়া তো যায় না। কোনওরকমে চাকরিটা করত দেবদ্যুতি। তারপর ছুটির পর ধর্মতলার কোলাহলমুখর জনারণ্যে একা একা ঘুরে বেড়াত। ঢুকে পড়ত পার্ক স্ট্রিটের কোনও বার-ও। মদ্যপান করত একা একাই কিছুক্ষণ। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি। মাঝে মাঝে আত্রেয়ীর ওপর খুব রাগ হত। হিংসা হত সেই যুবকটির প্রতি যাকে ভালোবাসে বলে আত্রেয়ী তাকে ওভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। খুব শাস্তি দিতে ইচ্ছে করত আত্রেয়ীকে। তখনই তার মনে হত, মেয়েদের ঠিকভাবে শাস্তি দেবার একমাত্র উপায় হল, শারীরিকভাবে তাদের নির্যাতন করা, কিংবা অপমান করা। সোজা কথায় তাকে ধর্ষণ করা। হ্যাঁ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও মেয়ের শরীরকে তছনছ করার মধ্যেই তো সেই মেয়েটির চরম অপমান। কিন্তু আত্রেয়ীকে পাবে কোথায়? সে তো তার প্রিয় পুরুষের সঙ্গে বাঙ্গালোর না কোথায় চলে গেছে। তখন দেবদ্যুতির একটা অদ্ভুত ইচ্ছে জাগত মনে। এই যে পার্কস্ট্রিটে, ধর্মতলার আনাচে-কানাচে মেয়েরা সব ঠোঁটে রং মেখে, শরীরকে যতটা পারে প্রকাশ্য করে ঘুরে বেড়ায়, চোখের ইঙ্গিতে পুরুষদের ডাকে; তাদেরই কারোর সঙ্গে যে কোনও হোটেলের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই দেহপজীবিনীর শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একসা করে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস পেত না দেবদ্যুতি। চোখের সামনে ভেসে উঠত এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে এডস্ রোগের ঝলমলে বিজ্ঞাপন।

একদিন সন্ধের পর ধর্মতলার ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিল। উদ্দেশ্য পার্ক স্ট্রিটের কোনও

চেনা 'বার'। ভিড়ের মধ্যে হাত ধরে টেনেছিল কেউ। ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল ফর্সা, গোলপানা একটা মুখ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। প্রায় সব দাঁত বিকশিত করে হাসছিল মুখটা।

—চেনা যাচ্ছে না এই তো? ...শালা এরকম উদাস ভঙ্গিতে কোথায় যাচ্ছিস? কবিতা-টবিতা লেখা এখনও ছাড়িসনি? চালিয়ে যাচ্ছিস? প্রথমে সত্যিই চিনতে পারেনি দেবদ্যুতি।

তারপর অবশ্য পেরেছিল। কথার ধাঁচে। স্বরের ভঙ্গিতে। অবশ্য দোষও যে তেমন ছিল দেবদ্যুতির তাও বলা যাবে না। সেই ছিপছিপে, সুদর্শন চেহারা কোথায় হারিয়ে গেছে প্রসূনের? বেশ মোটা হয়ে গেছে। মাথার চুলও সামনের দিকে উঠে বেশ টাক বেরিয়ে এসেছে।

—এরকম কুমড়োপটাশের মতো চেহারা করলে চিনব কী করে?

—আরে ওতো ইনডিভিউজুয়াল মেটাবলিজমের ব্যাপার। কেউ কেউ তোর মতো ফরচুনেট। কোনওদিন শরীরে ফ্যাট লাগে না। কেউ কেউ আমার মতো। শালা জল খেলেও তা শরীরে গিয়ে ফ্যাট-এ কনভার্ট করে।

অনেকদিন পর দেখা হয়েছিল হঠাৎই প্রসূনের সঙ্গে। গ্র্যাজুয়েশন-পর্ব শেষ করে প্রসূন জার্নালিজম পড়তে ভর্তি হয়েছিল যাদবপুরে। আর দেবদ্যুতি এম. এস-সি. পড়তে চলে গিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর থেকে আর ঘনঘন দেখা হত না দুজনের। তবে নানা বন্ধুদের মাধ্যমে খবর ঠিকই এসে যেত দেবদ্যুতির কাছে। জার্নালিজমের পাঠ শেষ করে একটা ইংরেজি দৈনিকে রিপোর্টারের চাকরি দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিল প্রসূন, এই খবর ছিল দেবদ্যুতির কাছে। তারপর একদিন প্রসূনই ফোনে তাকে জানিয়েছিল যে, সে তাদের কাগজের দিল্লি-অফিসে বদলি হয়ে যাচ্ছে। তারপর থেকে আর যোগাযোগই ছিল না দুজনের।

প্রসূনের পাল্লাতেই পড়ে সেদিন প্রেস-ক্লাবে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। সেখানে আগে কোনওদিন যায়নি। ভালোই লেগেছিল জায়গাটা। যত রাজ্যের রিপোর্টারদের ভিড়। প্রেসের সদস্যদের বিশ্রম্ভালাপ এবং সস্তায় মদ খাবার জায়গা। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে কথা হয়েছিল দুজনের। প্রসূন জানিয়েছিল, সে গত তিন-চার মাস হল, দিল্লি অফিস থেকে আবার কলকাতার অফিসে ফিরে এসেছে। এখন সে আর সাংবাদিক নয়। পরিচিত সেই ইংরেজি দৈনিকের একজন সাব-এডিটর। জমিয়ে সংসার করছে যোধপুর পার্কের একটা ফ্ল্যাটে। দেবদ্যুতি বিয়ে করেনি জেনে বেশ আশ্চর্য হয়েছিল। ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছাড়া নিজের আর কোনও খবর দেয়নি দেবদ্যুতি। আত্রেয়ীর ব্যাপারটাও চেপে গিয়েছিল। কী হবে ওসব বলে? সেদিন প্রেস ক্লাবে বসেই প্রসূন অপ্রত্যাশিত সেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল পুরনো বন্ধুকে।

—তুই কি লেখা-টেখা এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস? —জানতে চাইল প্রসূন।

—সেভাবে লিখি না। তবে একেবারে ছাড়িওনি।

—কলেজ-লাইফে তো ভালো কবিতা লিখতি? তোর সেই একটা লাইন আজও মনে আছে ...।

—কোন লাইন?

—সেই যে ... সকল সঙ্গমের পর অপেক্ষায় থাকে শূন্যতার চাবুক আর অনিবার্য ঘুম ....। মার্ভেলাস লাইনটা লিখেছিলিস মাইরি। তবে আমার এখনও মনে হয় একটা শব্দ পালটে দিলে লাইনটা আরও অ্যাপিলিং হত...।

—কোন শব্দ?

—ঐ সকল শব্দটা। ...সকলের বদলে 'সফল' বসিয়ে দ্যাখ। আরও অ্যাপ্রোপিয়েট। ... সফল সঙ্গমের পর অপেক্ষায় থাকে শূন্যতার চাবুক আর অনিবার্য ঘুম ...। আমার অন্তত তাই মনে হয় বারবার। —কথাটা বলে হা হা হেসেছিল প্রসূন। দেবদ্যুতিও হেসেছিল। তবে আগলাভাবে। সঙ্গমের অভিজ্ঞতা তখনও তার হয়নি। সম্পূর্ণ কল্পনা থেকেই তো সে লিখে ফেলেছিল লাইনটা পনেরো কিংবা ষোলো বছর আগে।

—কবিতা লিখিস আর?

—নাহ। ... পোয়েট্রি হ্যাজ লেফট মী ...।

—তাহলে কী লিখিস?

—টুকটাক। ... মাঝে মাঝে খবরের কাগজের রবিবারের পাতায় গল্প। বন্ধুবান্ধবের লিটল ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ ... হয়তো রিভিউ...।

—গুড। তার মানে অভ্যাসটা এখনও আছে। পুরো গেরস্থ হয়ে যাসনি। তাহলে তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে।

—আমাকে দিয়ে? কী কাজ?

—শোন্ এতদিন নামী নিউজপেপারে চাকরি করে হাতে কিছু টাকাপয়সা জমেছে। একটা বাংলা কাগজ বের করতে চাই আমি।

—খবরের কাগজ?

—আরে নাহ ... সাহিত্য-পত্রিকা। মূলত কবিতা আর প্রবন্ধের কাগজ। গল্প এখন রাখব না। আপাতত ত্রৈমাসিক। বছরে চারটি ইসু ...। আমি একজন এডিটর খুঁজছি। তুই এডিটর হয়ে যা।

—কেন? তুই নিজে থাকতে আমি কেন?

—আরে আমার অতো সময় আছে নাকি? নিজের চাকরি, তারপর পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্যে ঘোরাঘুরি। কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। পত্রিকা চালাতে ফিনান্সের দিক থেকে কোনও অসুবিধে হবে না। আর পত্রিকার একটা অফিসও পাওয়া যাবে।

—কোথায়?

—গণেশ অ্যাভিনিউয়ে। আমার ভায়রা-ভাইয়ের ইলেকট্রনিক গুডসের বিজনেস।

ওর মেইন শো-রুমের সঙ্গে একটা ছোট ঘর আছে। সেটা তেমন কাজে লাগে না। আগে মালপত্র রাখত। এখন বিজনেস ফ্লারিশ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গো-ডাউন ভাড়া নিয়েছে। বড় গো-ডাউন। কাছেই। ম্যাডান স্ট্রিটে। তো ঐ ছোট ঘরটা আমার পত্রিকার অফিস হিসেবে ও স্পেয়ার করতে রাজি আছে। সামনের পয়লা বৈশাখেই পত্রিকার প্রথম ইসু পাবলিশ করব। তুই এডিটর। আমি প্রকাশক। পত্রিকার একটা নামও ভেবেছি।

—কী?

—বেলা-অবেলা।

—বাহ! ভালো নাম।

—আসলে আমার আলটিমেট ধান্ধা কী বলত? ...একটা পাবলিকেশন চালু করা। বেলা অবেলা পাবলিকেশন। আইডিয়াটা যদি ক্লিক করে যায় তাহলে কাগজের চাকরি ছেড়ে দেব। তুই রাজি তো?

রাজি হয়ে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। কীরকম একটা শূন্যতার মধ্যে কাটছিল তখন। 'বেলা অবেলা' সম্পাদনার কাজ পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অফিস ছুটির পর সোজা পত্রিকার অফিস। নানা রকমের কাজ। সম্পাদকের কাজ। তারপর রাত করে বাড়ি ফেরা। এরকমই চলছে তিন বছর। এই তিন বছরে মোট ১২টি সংখ্যা বেরিয়েছে পত্রিকার। পাঠক পেয়েছে। কিছু বিক্রি হয়। কিছু গ্রাহক জোগাড় করেছে প্রসূন। প্রকাশনা সে এখনও শুরু করেনি। খুব তাড়াতাড়িই করবে মনে হয়। তবে নিজের পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন সে প্রচুর পায়। এরকম বিজ্ঞাপন পেলে পত্রিকা চালু থাকবে মনে হয়। সম্পাদনার কাজে বেশ আনন্দ পায় দেবদ্যুতি। জীবনের মুহূর্তগুলোকে আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়াই তো হল আসল কাজ। শুধু সম্পাদনার কাজই তো নয়। হাতে কাগজ থাকার সুবিধের জন্যে নিজের লেখালেখিও বেড়েছে দেবদ্যুতির। 'বেলা অবেলা'-র প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকীয় তো লিখতেই হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে প্রবন্ধও লেখে। বেশ কঠিন কঠিন প্রবন্ধ। যেমন 'নাটকের তত্ত্ববিশ্ব' কিংবা 'স্যামুয়েল বেকেটের নাট্যদর্শন' ইত্যাদি।

হাঁটতে হাঁটতে, ঘামের সঙ্গে ক্যালোরি ঝরাতে ঝরাতে দেবদ্যুতি এসে পৌঁছল 'বেলা অবেলা'-র অফিসে। এসে দেখল সেই মেয়েটা বসে আছে। একা নয়। প্রসূনও আছে। প্রসূনের ভায়রা-ভাইয়ের বদান্যতায় 'বেলা অবেলা'-র অফিসের জন্যে এই ঘর যে পাওয়া গেছে তা খুব বড় নয়; আবার নেহাত ছোটও নয়। সেই ঘরে প্লাইউডের পার্টিশান দিয়ে প্রসূন তিনটে খুপরি-ঘর বানিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি ঘরে আছে ছোট টেবিল আর চেয়ার। সম্পাদকের ঘর। অর্থাৎ যেখানে দেবদ্যুতি বসে। সম্পাদনার কাজকর্ম করে। পাশের ঘরটি মৃণালবাবুর। মূলত প্রুফরিডার। কিন্তু অফিসের কেরানির কাজ এবং পত্রিকার কাজে প্রেস এবং অন্যান্য জায়গাতে যাওয়ার কাজও সেই করে। আর অফিসে ঢুকেই সামনের খুপরি-ঘরটি হল, ভিজিটরদের

জন্যে। একটা পত্রিকা থাকলেই তাকে ঘিরে বেশ কিছু লেখক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত নতুন লেখকদের ভিড় লেগেই থাকে। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে আসে তারা। লেখা দিতেও আসে। ভিজিটর যেদিন বেশি থাকে সেদিন দেবদ্যুতির নিজেকে বেশ ইমপর্টান্ট মনে হয়। এছাড়া অফিসে একজন পিয়ন গোছের ছেলেও আছে। সে এই অফিসে ঢোকার মুখে টুলে বসে থাকে। যখন যা দরকার ফাই-ফরমাশ খাটে। আসলে প্রসূনের আসল উদ্দেশ্য হল, প্রকাশনার ব্যবসা শুরু করা। যেটা সে এখনো সেভাবে শুরু করেনি। করবে হয়তো। প্রসূনের মধ্যে যে ব্যবসা-বুদ্ধিরও অভাব নেই সেটা দেবদ্যুতি কলেজজীবনে বোঝেনি। আর একটা দোষ, নাহ দোষ কেন? —বিশেষত্বই বলা উচিত; প্রসূনের মধ্যে আবিষ্কার করেছে দেবদ্যুতি। সেটা হল তার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার আগ্রহ।

আজ এই সন্ধেবেলা অফিসে ঢুকেই দেবদ্যুতি বুঝল মৃণালবাবু আসেনি। পিয়ন রতনকেও দেখতে পেল না। ভিজিটরস রুমে প্রসূনকে দেখতে পেল। প্রসূন একা নয়। সেই মেয়েটাও আছে। কী যেন নাম? ... মিতুল ...। মিতুল সেন। কবিযশোপ্রার্থিনী। মিতুলের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে দুটো সম্পদের অধিকারী, যা থাকলে মেয়েদের আত্মবিশ্বাসের অভাব হয় না। একটা হল রূপ। আর একটা হল যৌবন। কিন্তু মেয়েটা একেবারে কবিতা লিখতে পারে না।

নয়

ভিজির্টস-রুমে একফালি টেবিল। মৃণালবাবুরও ঐ ধরনের টেবিল। তবে দেবদ্যুতি সম্পাদক বলেই হয়তো তার টেবিলটা কিঞ্চিৎ বড়। ভিজিটরদের ঘরে টেবিলের ওপারে বসে আছে প্রসূন। টেবিলের এপারে দুটো চেয়ার। একটিতে বসে আছে মিতুল। তার ফর্সা, রোগা, পেলব এবং সোনার সরু চেন-শোভিত ডান হাত টেবিলের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে। প্রসূনের ঠোঁটে সিগারেট। খুব একটা হাসির কথা হচ্ছিল বোধহয়। দুজনেই হাসছিল। একবার তাকিয়েই দেবদ্যুতি বুঝল মিতুল দারুণ সেজে এসেছে আজ। তার কপালে গোল, মেরুন টিপ। ঠোঁটে মেরুন রং। পরনের জিনস্‌ও মেরুন। শুধু শ্লিভলেস টপটি ধবধবে সাদা। বকের পালকের মতো সাদা। দেবদ্যুতি যখন অফিসে ঢুকল, প্রসূন মুহূর্তে হাসি থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল—ঐ তো সম্পাদক এসে গেছেন; —ঠিক সেই মুহূর্তেই মিতুল পেছন ফিরে তাকিয়েছিল একঝলক। আর তাতেই তার পুরুষ-খ্যাপানো সাজ জরিপ করে নিয়েছিল দেবদ্যুতি। সত্যিই মেয়েটা প্রকৃত সুন্দরী। হঠাৎ দেখলে ল্যাটিন-আমেরিকার কোনও দেশের মেয়ে বলে মনে হয়। মাথার চুলও বয়কাট মিতুলের। কানের লতিতে দুটো ছোট পাথর। বরফের ছায়া সেই পাথরদুটোতে। ওগুলো পার্ল। ঝুটো নয়। খাঁটি। মিতুলের দিকে ভালোভাবে তাকাবার সুযোগই পেল না দেবদ্যুতি। কেননা সে একঝলক এদিকে তাকিয়েই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মিতুলের শরীরের সামনের দিকটা দেখতে পেল না দেবদ্যুতি। অবশ্য না তাকিয়েই বুঝে নিল, টপের উপরের অংশ বেশ খাটো মিতুলের। এতটাই খাটো, (পরিকল্পিতভাবে তৈরি মনে হয়,) যে মিতুলের বুকের বিভাজিকা সর্বদাই দৃশ্যমান। মিতুল যখন আসত তার কাছে তখন ঐ বিভাজিকার দিকে তাকালেই কীরকম গা শিরশির করে উঠত। কামের উত্তাপ ক্রমশ অনুভব করত সে নিজের ভেতরে। ট্রাউজারের নীচে, অন্তর্বাসেরও নীচে নিরীহ শুঁয়োপোকার মতো নেতিয়ে পড়ে থাকা তার শিশ্ন হঠাৎ যেন জেগে উঠত। যতক্ষণ অপরূপ বুক দুটোর বিভাজিকা অংশ প্রকাশ্য করে মিতুল বসে থাকত দেবদ্যুতির ঘরে, ততক্ষণই দারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে ছটফট করত সে। চোখ চলে যেত মিতুল যা দেখাতে চাইছে সেদিকে। আর তার শিশ্নটি ক্রমশ কঠিন ও দীর্ঘ হয়ে উঠছে সে বুঝতে পারত। পরে দেবদ্যুতি ক্রমশ বুঝে নিয়েছিল যে, মিতুল নিজের শরীর-সম্পদকে এভাবেই ব্যবহার করতে চায় কবি হবার জন্যে। 'বেলা-অবেলা'-র পৃষ্ঠায় কবিতা ছাপানোর জন্যে। সেটা যখন বুঝেছিল তখন দেবদ্যুতি মনে মনে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল মিতুলকে। বুকের বিভাজিকা

দেখিয়ে কিংবা তার সঙ্গে সিনেমা যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েও মিতুল সম্পাদক-কে কাত করতে পারেনি। যা সে কালক্রমে পত্রিকাব প্রকাশককে করতে পেরেছে।

কতক্ষণ এসেছে মিতুল? অনেকক্ষণ হয়তো। দেবদ্যুতি ওদের দিকে একবার তাকিয়েই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। প্রসূনই নিজে থেকে কথা বলল আরও। দেবদ্যুতির মনে হল কীরকম যেন কৈফিয়তের সুরে বলল প্রসূন—এই তো সম্পাদক এসে গেছেন। ... তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম দেবু। তুই এসে গেছিস। চিন্তা নেই। অফিস তো ফাঁকা রাখা যায় না? ... এবার আমরা বেরোব।

—মৃণালবাবু আসেনি? ...রতন?

—মৃণালবাবু প্রেসে গেছে। রতনকে চা আনতে পাঠিয়েচি। —প্রসূন যখন এই কথাগুলো বলল তখন মিতুল আর একবার ঘুরে তাকাল দেবদ্যুতির দিকে। তার দুচোখে যেন কৌতুকের ঝলক। দেবদ্যুতি নিজের চোখ সরিয়ে নিল। তার অস্বস্তি হয় মিতুলের দিকে তাকাতে।

—রতন এলেই চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। আমি আজ আর ফিরব না। অফিস বন্ধ করে রতনের কাছে চাবি দিয়ে যাস। প্রসূনের এই কথায় দেবদ্যুতি ঘাড় নাড়ল।

—ঐ তো রতন এসে গেছে! —প্রসূন বলল। —দুটো চাকে তিনটে কর। দেবুর জন্যে এককাপ।

—আমি পরে নিলেও তো হয়—। ক্ষীণভাবে বলল দেবদ্যুতি।

—সে পরে আবার নিবি। এখন তো খা এককাপ। সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক। চা-তে অনীহা হলে হবে? সিগারেট দে—। আমার ফুরিয়েছে। বেরিয়ে কিনব।

দেবদ্যুতি পকেট থেকে সিগারেট-প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরল। প্রসূন চেয়ার থেকে উঠে এসে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেবদ্যুতিরই লাইটারে ধরিয়ে নিল। দেবদ্যুতি নিজের ঘরে চলে গেল। টেবিলে চা দিয়েছে রতন। কাপে চুমুক দিল। একটু পরেই বুঝল, প্রসূন আর মিতুল বেরিয়ে গেল। টেবিলে ফাইলের ডাঁই থেকে কবিতার ফাইলটা টেনে নিল দেবদ্যুতি। কাজে মন দিল। ...

মিতুল প্রথমে আলাপ করতে এসেছিল দেবদ্যুতির সঙ্গে। প্রায় চার মাস আগে। একদিন অফিস থেকে এসে সে এঘরে সম্পাদকের চেয়ারে বসে সবে কাজে মন দিয়েছে। মিতুল এসে হাজির হয়েছিল। সেই প্রথম। সেদিন অবশ্য তার সাজগোজ এবং বেশভূষা বেশ পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্র ছিল। শাড়ি পরে এসেছিল মিতুল। ব্লাউজও হাতাহীন ছিল না। যদিও একনজর তার দিকে তাকিয়েই দেবদ্যুতির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। প্রকৃত সুন্দরীকে দেখলেই তার এরকম হয়।

—বসতে পারি? —হাস্কি স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল মিতুল।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। —সামনের চেয়ারে বসেছিল মিতুল। আর দেবদ্যুতি। অপার

মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ভেতরে ভেতরে ঘামছিল। সুন্দরী মেয়ের সামনে পড়লেই এই তার এক মুদ্রাদোষ। শুধু তাপসীর সামনে এরকম হয়নি। প্রথম কারণ তাপসী সুন্দরী নয়। দ্বিতীয় কারণ প্রথমে তার সঙ্গে তাপসীর সম্পর্ক ছিল মনিব এবং বেতনভুক কর্মচারীর।

—বেলা অবেলা যবে থেকে পাবলিশ হচ্ছে আমি পড়ছি। প্রতি সংখ্যাই আমার কালেকশানে আছে।

—তাই? ... বাহ শুনে ভালো লাগচে।

—আমিও একটু-আধটু লেখালেখি করি।

—আচ্ছা? কী লেখেন? কবিতা?

—হ্যাঁ। —লাজুক হেসেছিল মিতুল।

—ছাপা হয়েছে কোথাও?

—অনেক জায়গাতে পাঠিয়েছি। একটাও ছাপা হয়নি।

—এনেছেন কবিতা?

—এনেছি। —হাতের সুদৃশ্য লেদার-ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করেছিল মিতুল। বাড়িয়ে ধরেছিল। খামটা নিয়েছিল দেবদ্যুতি। প্যাডের পৃষ্ঠায় লেখা চারটি কবিতা ছিল। নামটা দেখেছিল। মিতুল সেন। এক নজরে দেখে হস্তাক্ষরটি বড় সুন্দর মনে হয়েছিল দেবদ্যুতির। খামটা একটা ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বলেছিল—পড়ব ... পড়ে জানাব।

—কবে জানাবেন?

—কিছুদিনের মধ্যেই।

—কবে আসব আমি?

—আপনি ... আপনি ... ফোন করতে পারেন। আমাদের পত্রিকাতেই তো আমাদের ফোন-নাম্বার আছে। আমার মোবাইল নাম্বার রাখতে পারেন। দেবদ্যুতির মোবাইল-নাম্বার নিয়েছিল মিতুল। তারপর চলে গিয়েছিল।

মেয়েটিকে দেখে ভালো লেগেছিল বলেই দেবদ্যুতি সঙ্গে সঙ্গেই খাম থেকে বের করে নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল কবিতাগুলো। আর পড়েই বুঝেছিল মিতুল সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু সে কবিতা লিখতে একেবারেই পারে না। এখনকার কবিতার ভাষা যে কতটা পালটে গেছে সে বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই মিতুলের। আধুনিক কবিতা সে বোধহয় পড়েওনি তেমন। হাস্যকর তার কবিতার ভাব। হাস্যকর তার কবিতার ভাষা। যেমন একটা কবিতায় মিতুল লিখেছে—'আমি ডানা মেলে উড়ে যেতে চাই/যদি তোমারে মোর পাশে পাই/আমি মধ্য গগনে আত্মমগনে/পাগলের মতো ধাই।' পড়ে খুব হেসেছিল দেবদ্যুতি নিজের মনে। কিংবা আর একটা কবিতায় ওরকম লিখেছিল মিতুল—'না! না! এ তো মরীচিকা/কার তরে তবে ভেবে মরে

প্রেমের অট্টালিকা?' একেবারে রাবিশ! এসব কি কবিতা নাকি? 'বেলা অবেলা'র-মতো উঁচু মানের পত্রিকায় এসব কবিতা ছাপা হবে? শুধু রূপ থাকলেই সবকিছু পারা যায় নাকি? রাগে গা-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল দেবদ্যুতির। সে কিছুক্ষণ আগে মিতুলের দিয়ে যাওয়া লেখাগুলো দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়েছিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। তারপর ভুলে গিয়েছিল সেগুলোর কথা।

ঠিক সাতদিন বাদে দেবদ্যুতির মোবাইল ফোন বেজে উঠেছিল। মিতুল ফোন করছে। সেই রিনরিনে স্বরে প্রথমে জিজ্ঞেস করল—ভালো আছেন দেবদ্যুতি-দা?

—হুঁ ... ভালোই। —অফিসে তখন কাজে ব্যস্ত ছিল দেবদ্যুতি। বড় অসময়ের ফোন।

—আপনাকে কি ডিসটার্ব করচি?

—হ্যাঁ। তা তো একটু করছেনই। আমি এখন অফিসের কাজে ভীষণ ব্যস্ত।

—ওহ্—সরি সরি—আচ্ছা পরে যোগাযোগ করব।

তখনকার মতো হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বটে দেবদ্যুতি। কিন্তু তারপরই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। মিতুল কেন ফোন করেছে সে তো জানে। তার লেখাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করবে। কী বলবে দেবদ্যুতি? সরাসরি বলবে যে একটা লেখাও তার ভালো লাগেনি। কোনওটাই 'বেলা অবেলা'-র পৃষ্ঠায় ছাপার যোগ্য নয়। তারপর কী করবে মেয়েটা? আবার একগুচ্ছ কবিতা দিয়ে যাবে? সেগুলোও তো না পড়েই রিজেক্ট করতে হবে দেবদ্যুতিকে। কারণ সে তো বুঝে গেছে, মিতুলের দ্বারা আর যে কোনও কাজ হতে পারে। কিন্তু কবিতা অন্তত হবে না। প্রায় একশ বছর আগেকার ভাষায় কবিতা লিখেছে মিতুল। এখন কার কবিতার ভাষা বা প্রকরণ বিষয়ে তার কোনও ধারণাই নেই। সুতরাং... সুতরাং অতিশয় সত্যটা মুখের ওপর, বলে দেওয়াই ভালো। পরের বার মিতুলের ফোন পেলে দেবদ্যুতিকে বলতেই হবে সেটা।

ফোন আর করেনি মিতুল। সেদিন সন্ধের দিকেই সরাসরি চলে এসেছিল পত্রিকার অফিসে। সেদিনও অফিস ফাঁকাই ছিল। মৃণালবাবু প্রেসের কাজে বাইরে। প্রসূনের পাত্তা ছিল না। সে তার খবরের কাগজ থেকে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় খরার অবস্থা নিজের চোখে দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। দু-তিনদিন বাইরেই থাকবে। শুধু নিরীহ পিয়ন রতন অফিসের দরজার কাছে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল।

—আসতে পারি?—মিতুল এসে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের কাছে। মুখ তুলে তাকিয়েছিল দেবদ্যুতি। ভীষণ সেজে এসেছিল মিতুল। সেদিন আর শাড়ি নয়। জিনস আর টপ। সমুদ্র-নীল জিনস। আর ঘি-রং কিংবা অফ-হোয়াইট জামা। খুব খাটো জামা। আর ভীষণ আঁটোসাঁটো। মিতুলের সুগঠিত, উঁচু বুকদুটো সেই আঁট জামায় যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তীব্র কিন্তু সুমিষ্ট কোনও পারফিউমের সুবাস ভেসে আসছে মিতুলের উপস্থিতিতে। তার গলায় সরু সোনার হার।

ডানহাতে সরু চেন। সেটা আসলে কবজিঘড়ি। একটু নজর করে দেবদ্যুতি বুঝেছিল। দেবদ্যুতি কিছু বলার আগেই মিতুল নিজেই ঢুকে পড়েছিল ঘরে। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল। কাঁধের ব্যাগটা হঠাৎ নিচু হয়ে ঝুঁকে পায়ের কাছে রেখেছিল মিতুল। আর তাতেই যা দেখার দেবদ্যুতি দেখেছিল। মিতুলের টপ কিংবা জামাটা খুব আঁটোসাঁটো। কিন্তু বুকের কাছে খুব খাটো হওয়ায় সমুদ্রের বেলাভূমির মতো ঝকঝকে বিভাজিকা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল দেবদ্যুতি। শরীরে একটা বিচিত্র শিহরন অনুভব করেছিল সে। দেবদ্যুতির চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল মিতুল।

—কবিতাগুলো পড়লেন?

—অ্যাঁ.......হ্যাঁ....পড়েছি।

—কেমন লাগল? ছাপছেন?

কী উত্তর দেবে দেবদ্যুতি? সে কি সত্যি কথা বলবে? টেবিলের ও প্রান্তে যৌনতার সাক্ষাৎ আগ্নেয়গিরি হয়ে বসে ছিল মিতুল। তখনও নারীর ভরন্ত যৌবনের কোনও স্বাদ পায়নি দেবদ্যুতি। মাত্র কিছুদিন আগে আত্রেয়ী আকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। সেই তীব্র অপমান বোধ তখনও সময়-অসময়ে কষ্ট দিত দেবদ্যুতিকে। একাকীত্বের শূন্যতার নিঃসীম অন্ধকারে সে তখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হতাশায় ছেয়ে আছে জীবন। শুধু একটু পদস্খলন দরকার ছিল সেদিন। নিজের অর্জিত বিশ্বাস এবং বোধের জায়গা থেকে সরে এসে কিঞ্চিৎ সত্যের অপলাপ করা। মিতুলকে বলতে পারা যে তার কবিতাগুলো ভালো হয়েছে। ছাপা হবে পত্রিকায়। এই বদান্যতার বিনিময়ে মিতুলের কাছ থেকে সে অনেক কিছু পেতে পারত। মিতুল কি বিবাহিত? সে জানত না। বুঝত না। কী দরকার ছিল বোঝার কিংবা জানার? সামান্য কবিতা ছাপার জন্যে মিতুল তার যাবতীয় সম্পদ নিয়ে সর্বনাশের আশায় বসেই তো ছিল। কিন্তু তবুও কী এক আড়ষ্টতাবোধে সেদিন মিতুলের সেই ইঙ্গিতময় আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেনি সে। তবুও মিতুল হাল ছাড়েনি। সত্যিই অস্বাভাবিক চরিত্রের মহিলা মিতুল। নিজের শরীরের বিনিময়ে লেখকখ্যাতি অর্জন করতে চায় সে। এই শহরে এরকম মহিলা কি আরও আছে? সেদিন সরাসরি উত্তর দেবার কষ্ট থেকে মিতুলই বাঁচিয়ে ছিল তাকে।

বলেছিল—চলুন-দেবদ্যুতি দা একটু বেড়িয়ে আসি।

—এখন?....কোথায়?

—যেখানে হোক। গ্লোবে একটা ভালো সিনেমা চলছে। দেখতে পারি। নাইট শো। তা না হলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে কোনও কফি-শপে বসতে পারি। চলুন....!

স্পষ্ট আহ্বান। মিতুল হাসির ঝর্না হয়ে বসেছিল। আর দেবদ্যুতিকে আড়চোখে তার উজ্জ্বল বিভাজিকার দিকে তাকাতে হচ্ছিল বারবার। হঠাৎ কী হয়েছিল দেবদ্যুতির। তার ভেতরে কে যেন বলছিল—নাহ নাহ নাহ... নিজের শরীরের

বিনিময়ে এই নারী কবিতা ছাপাতে চায়! যে কবিতা লিখতেই জানে না, তাকে তুমি কেন মদত দেবে দেবদ্যুতি? নিজের আদর্শ থেকে সরে আসবে? বেলা অবেলা' ছোট পত্রিকা হতে পারে। তার সার্কুলেশন কম হতে পারে। তবুও সেই ছোট পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটা আদর্শ তো তোমার আছে? এই নারীর শরীরের বিনিময়ে তার অ-কবিতাগুলো পত্রিকায় ছাপানো মানে নিজের আদর্শ থেকে সরে আসা। কবিতাকে তুমি ভালোবাস। সাহিত্য তুমি ভালোবাস। অনেক হতাশা আর নিঃসঙ্গতার মাঝে কবিতা তোমাকে বেঁচে থাকতে প্রেরণা যোগায়। তোমার নির্জন বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা হল এই পত্রিকার সম্পাদনা করা। সেই অনুপ্রেরণাকে তুমি অপমান করবে?.....হঠাৎই নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল দেবদ্যুতি। মিতুলকে রীতিমতো অবাক করে বলেছিল—আপনার কবিতা আমার পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়।

—মানে?

—আপনি কবিতা লিখতে জানেন না। ঐ লেখাগুলো কবিতা হয়নি। ঐ ভাষায় আজকাল কেউ কবিতা লেখে না। আপনি পোশাক পরিচ্ছদে অনেক আধুনিক। কিন্তু আধুনিক কবিতা আপনি কিছুই বোঝেন না। আপনার লেখা আমি ছাপতে পারছি না।....আপনি আসুন—আমাকে কাজ করতে দিন।

এত প্রত্যক্ষ এবং তীব্রভাবে যে কথাগুলো বলতে পারবে এটা দেবদ্যুতি নিজেই বুঝতে পারেনি। যেন সে নিজে নয়। তার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথাগুলো বলেছিল। মুহূর্তে অপমানে কালো হয়ে গিয়েছিল মিতুলের ফর্সা মুখ। দেবদ্যুতির আগুন মূর্তি দেখে সে নিজেও কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার আত্মবিশ্বাসে কোথাও চিড় ধরেছিল। ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল পত্রিকার অফিস থেকে।

অবশ্য শেষমেশ মিতুলের কবিতা ছাপতে হয়েছিল দেবদ্যুতিকে অনেক সংশোধন এবং এডিট করে। প্রসূন একদিন একগোছা কাগজ এনে ধরেছিল দেবদ্যুতির চোখের সামনে।

—এই কবিতাগুলো ছাপতে হবে দেবু...।

এক নজর দেখেই দেবদ্যুতি বুঝেছিল সেগুলো মিতুলের কবিতা। সঙ্গে সঙ্গে সে জানিয়েছিল—এগুলো কবিতা নাকি? যে ছাপব?

—জানি।—প্রসূন বলেছিল,—একেবারে লিখতে পারে না মেয়েটা। তবুও ছাপতে হবে। আমার রিকোয়েস্ট।

—তুই কি ওর কাছে ওবলাইজড?

—এতদিন তোকে বলিনি দেবু। হয়তো বলার মতো অকেশনও আসেনি। পার্সোনাল লাইফে আমি কিন্তু ভীষণ ডিসটার্বড। আমার স্ত্রী মধুছন্দা আমার সঙ্গে থাকে না আজ প্রায় একবছর। ডিভোর্সের মামলা করেছে ও। আমি বড় লোনলি

দেবু। আমাদের চার বছর বিয়ে হয়েছিল। কোনও সন্তান হয়নি। একেবারে বনিবনা হচ্ছিল না আমাদের প্রথম থেকেই। ওভাবে নিত্যদিন অশান্তির মধ্যে এক ছাদের নীচে থাকা আর সম্ভব হচ্ছিল না। মধুছন্দা চলে গেছে ভালোই হয়েছে। এখন মিতুল আমাকে সঙ্গ দেয়। মিতুলের লেখাগুলো তোকে ছাপতে হবে আমার মুখ চেয়ে।

—সম্ভব নয়। আমি আর তোর কাগজের এডিটর থাকতে পারব না। তুই অন্য কাউকে খুঁজে নে।

—প্লিজ দেবু।.....তুই আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কর। কাগজটা তোকে চালাতেই হবে। পাবলিকেশনও শুরু করে দেব আমি। কিছুদিনের মধ্যেই। মিতুলকে আমি ছাড়তে পারব না। লেখক হবার ব্যাপারে ওর একটা পিকউলিয়ার অবসেশন আছে। আর শরীর নিয়ে ওর কোনও ছুৎমার্গ নেই। এরকম একজনকে আমি চেয়েছিলাম। টু গেট রিড অব মাই অ্যাবিসমাল লোনলিনেস।....সামান্য দুটো কবিতা ছাপলে ও যদি মেনট্যাল সাটিফ্যাকশন পায় সেটা করতে দোষ কোথায়? এতে তোরই বা কী এমন ক্ষতি হবে? স্তম্ভিত হয়ে প্রসূনের কথাগুলো শুনেছিল দেবদ্যুতি। পরের মাসের 'বেলা অবেলা'-য় মিতুল সেনের গুচ্ছকবিতা প্রকাশিত হয়েছিল....

দশ

সত্যিই বিনা কারণে আত্রেয়ী নামের অচেনা মেয়েটির কাছ থেকে আঘাত এসেছিল দেবদ্যুতির জীবনে। কোনও কার্যকারণ সূত্র ছিল না। সে তো আর নিজে থেকে বিয়ে করতে চায়নি আত্রেয়ীকে। সম্বন্ধ এনেছিল মা, অনিলা।

নাহ, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সত্ত্বেও এবং নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখে সহপাঠীদের কাছে বেশ বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও দেবদ্যুতি কোনও মেয়ের সঙ্গে কিংবা একাধিক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে বরাবরই পিছিয়ে ছিল। সে মনে মনে অনেক মেয়ের প্রেমে পড়া সত্ত্বেও তাদের কাউকে মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারেনি। আর কে না জানে প্রেম করার ব্যাপারে নিজের মনের ভাব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্ত করতে পারাই হল আসল। মেয়েরা বরাবরই সাহসী পুরুষদের পছন্দ করে। কো-এডুকেশন কলেজে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য হয়নি দেবদ্যুতির। কলেজের প্রিয় বন্ধু ছিল প্রসূন। প্রেম করার ফুরসুতই পায়নি দেবদ্যুতি। কলেজের ক্লাশ করার পর দুজনে ঘুরে বেড়াত নানা জায়গায়। তখনই বুঝেছিল এই শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাতালে নেমে যাবার কতো চোরাগলি আছে। তখন শুধুই অভিজ্ঞতা লাভের নেশায় ঘুরে বেড়াত দেবদ্যুতি। কারণ কোথায় যেন সে পড়েছিল লেখক হতে গেলে যা প্রথমে দরকার তা হল অভিজ্ঞতা। সুতরাং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের তীব্র বাসনায় সে শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াত। সঙ্গী ছিল এক এবং অদ্বিতীয় প্রসূন। এভাবেই দেবদ্যুতি ক্রমশ চিনে নিয়েছে এই শহরের পানশালা এবং রেঁস্তোরাগুলো। হাড়কাটা গলি এবং দুর্গাচরণ মিত্রের থমথমে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তারা দুজনে কতবারই না হেঁটে গিয়েছে। যদিও ভুলেও সাড়া দেবার সাহস হয়নি কোনও চটুল গণিকার লাস্যময় আহ্বানে।

ইউনিসিভার্সিটিতে পড়তে এসে প্রসূন ছিল না সঙ্গে। বন্ধুবান্ধব কিছু জুটেছিল ঠিকই। তাদের সঙ্গে আড্ডাও দেওয়া হ'ত কফিহাউসে কিংবা বসন্ত কেবিনে। শুধু ছেলে-বন্ধু কেন। মেয়ে-বন্ধুও ছিল। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি কোনও মেয়ের সঙ্গে। একেবারে হয়নি কি বলা যাবে? রূপাইয়ের কথা সে অস্বীকার করবে কী করে? রূপাই মেয়েটা দেখতে যে খুব আহামরি ছিল তা অবশ্য নয়। মাঝারি উচ্চতা। খুব ফর্সা নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যা বরাবরের পছন্দ দেবদ্যুতির। হ্যাঁ এটা ঠিক। খুব ফর্সা মেয়েদের দেখতে কোনওদিনই তেমন ভালো লাগে না তার। মুখশ্রী যতই ভালো হোক। এর কোনও কারণ নেই। ভালো লাগা কিংবা মন্দ লাগার ব্যাপারে কি কোনও কারণ থাকে?

রূপাইয়ের গায়ের রং ছিল মেঘলা দিনের মতো গাঢ় ছায়াময়। ক্লাশে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে হঠাৎই চোখ তুলে দেবদ্যুতি চমকসহ আবিষ্কার করেছিল যে, রূপাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। এরপর আলাপ না করা নেহাতই বোকামি। তাই একদিন সাহস করে দেবদ্যুতি নিজেকে বন্ধুদের থেকে আলাদা করে নিয়ে রূপাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেল।

একা একাই চলাফেরা করত রূপাই। একা ক্লাশে আসত। একা বেরিয়ে যেত। যখন ক্লাশ থাকত না লাইব্রেরির সিঁড়িতে কিংবা লনের সবুজে একা একা বই মুখে দিয়ে বসে থাকত। একদিন বন্ধুরা তাকে ডাক দিয়ে ক্যান্টিনের দিকে চলে গেছে। আশুতোষ বিল্ডিং-এর চওড়া, গথিক এবং আলোছায়াময় সিঁড়ি দিয়ে একা নামছিল দেবদ্যুতি। পেছনে পায়ের মৃদু শব্দে ঘুরে তাকিয়ে দেখেছিল রূপাইকে। লতাপাতা-আঁকা সালোয়ার-কামিজ। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। দেবদুতি তাকাতেই সম্ভবত ভদ্রতাবশত এক ফালি হেসেছিল রূপাই। এরপর কথা না বললে অভদ্রতা হবে।

দেবদ্যুতি প্রশ্ন করেছিল—কেমন লাগল?

—কী?

--পি. লালের দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড পড়ানো?

—সুপার্ব। এমনি এলিয়টের কবিতাটা কী কঠিন লাগে। উনি আজ কিছুটা পড়াতে মনে হচ্ছিল—

—জলবৎতরলং?

—এগজ্যাক্টলি।

—কোথায় যাবেন এখন?

—যাবেন আবার কী? ক্লাশ-মেটদের সঙ্গে আপনি চলে? দেবদ্যুতিকে রীতিমতো অপ্রতিভ করে দিয়েছিল রূপাই।

এভাবেই আলাপের শুরু। তারপর কবে যেন জমে গিয়েছিল সেই আলাপ। রূপাই থাকত উত্তর চব্বিশ পরগনার সোদপুরে। ক্লাশ শেষ হয়ে যাবার পর দুজনে মহাত্মা গান্ধী রোডের ভিড়াক্কার ফুটপাত দিয়ে গল্প করতে করতে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে যেত। প্রতিদিন রূপাইকে ট্রেনে তুলে দিত দেবদ্যুতি। এভাবেই প্রায় একমাসের মতো। তারপর একদিন প্রস্তাব এল রূপাইয়ের কাছ থেকে। একটা সিনেমা দেখতে চায় সে—হাতিবাগানের একটা প্রেক্ষাগৃহে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র মন্দ মেয়ের উপাখ্যান। দেবদ্যুতি কি যাবে?

গিয়েছিল দেবদ্যুতি। একেবারে ব্যালকনির টিকিট কিনেছিল নিজেই। রূপাই টিকিটের দাম দিতে চাওয়ায় কিছুতেই শোনেনি। কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা সেটাই ছিল প্রথম। ছবি শুরু হবার পর ছবিতে তেমন মন ছিল না দেবদ্যুতির। তার শুধুই মনে হচ্ছিল পাশে

একজন মেয়ে বসে আছে যাকে কি ছোঁয়া যেতে পারে অন্ধকারের সুযোগে? তীব্র কামভাব জেগেছিল দেবদ্যুতির মনে। তার শুধুই মনে হচ্ছিল নিজের বাঁ-কনুই ক্রমশ এগিয়ে দিয়ে (রূপাই বসেছিল তার বাঁ-দিকে, এবং ও-পাশের চেয়ারটিতে কোনও দর্শকও ছিল না, যা প্রায় অকল্পনীয় এক সুযোগ) সে ছুঁয়ে দেয় রূপাইয়ের কোমর; তারপর আরও একটু সাহসী হয়ে তার সুগঠিত স্তনের আশপাশ। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছিল দেবদ্যুতির কপালে। ছবির মাথামুন্ড সে কিছুই বুঝছিল না। কানের লতিদুটোতে গরমের অনুভব। আর শুধুমাত্র রূপাইকে স্পর্শ করার ভাবনাতেই ট্রাউজার এবং অন্তর্বাসের বাধা অগ্রাহ্য করে তার শিশ্ন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! কনুইকে এগিয়ে দেবার ব্যাপারে শেষমেশ সাহসই পেল না সে। শুধু মনে হচ্ছিল রূপাই যদি কিছু মনে করে? যদি সে অন্ধকারের গভীরতা তছনছ করে প্রতিক্রিয়া জানায়? একী? এরকম অসভ্যতা করছ কেন? তোমাকে তো অন্যরকম ভেবেছিলাম? প্রায় আড়াই ঘণ্টা নিজের কাছেই আড়ষ্ট হয়ে, এলোমেলো চিন্তার ঝড় মাথার মধ্যে নিয়ে দেবদ্যুতিকে নিরুপায়, সিদ্ধান্তবিমুখ বসে থাকতে হয়েছিল। এর মধ্যে দু-বার অবশ্য এমনিই ছবিতে মশগুল থাকার গাঢ় অন্যমনস্কতায় রূপাইয়ের হাত আচমকা এসে পড়েছিল দেবদ্যুতির হাতে। একবার যেন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বসার মুদ্রাও পালটেছিল রূপাই। ফলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে রূপাইয়ের কোমরের উপরিভাগ ছুঁয়ে গিয়েছিল দেবদ্যুতির সঙ্কুচিত হয়ে গুটিয়ে থাকা কনুই। রূপাই ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎই তার দিকে ঝুঁকে আসায় দেবদ্যুতি অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছিল চেয়ারের হাতল থেকে। ভদ্রতা করেছিল। তার মনে হয়েছিল, রূপাইয়ের শরীরের সঙ্গে নিজের কনুই ঠেকিয়ে রাখলে সে বিরক্ত হতে পারে; খারাপ ভাবতে পারে দেবদ্যুতিকে। এভাবে কখন সিনেমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হবার সময় দেবদ্যুতি লক্ষ করেছিল রূপাইয়ের মুখ ভীষণ গম্ভীর। তাহলে কি ছবিটা ভালো লাগেনি তার? কিন্তু আলোচনা করে দেখেছে রূপাই ঐ পরিচালককে খুবই পছন্দ করে। রূপাই একবার এরকমও বলেছিল যে, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবিতে থাকে মেধা, কল্পনা, কাহিনী আর ক্যামেরার সমানুপাতিক মেলবন্ধন। তাহলে? ছবি দেখার পর সে এত গম্ভীর ছিল কেন?

—কেমন লাগল ছবি? ভালো লাগেনি বুঝি?

—ভালোই। বেশ ভালো।—উত্তর দিয়েছিল রূপাই। তাহলে তাকে এত গম্ভীর লাগছিল কেন? মনে মনে বহুবার সে স্পর্শ করেছে রূপাইকে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে। তার রসালো ফলের মতো দুই স্তনকে দুমড়েছে, মুচড়েছে কল্পনায়। কিন্তু যত ভেবেছে এসব, ধীরে ধীরে ভিজে উঠেছে তার অসহায় অন্তর্বাস; আর ততোই সে নিজেকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। সতর্ক নজর রেখেছিল যেন তার লোলুপ কনুই কোনও ভুল কিংবা হঠকারিতা না করে বসে। কিন্তু তবুও....? তবুও রূপাই এতো গম্ভীর ছিল কেন? কী ভাবছিল সে? এমনকী কোনও রেস্তোরাঁয় বসে চা

খাবার অফারও প্রত্যাখ্যান করেছিল রূপাই। তারপর 'তাড়া আছে' অস্ফুটে জানিয়ে শিয়ালদহগামী একটা বাসে উঠে হাত নেড়েছিল রূপাই। এই ঘটনার সাতদিন পরে দেবদ্যুতি দেখেছিল রূপাই অন্য একটা ছেলের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের ক্লাশের নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখার ছাত্র। দেবদ্যুতির সঙ্গে আর কোনওদিন কথা হয়নি রূপাইয়ের, মেয়েটা যেন তাকে এড়িয়ে যেত। মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়েছিল দেবদ্যুতি। পরবর্তী জীবনে তাপসীর সঙ্গে দিনের পর দিন অবাধে শোয়া-বসার পর, প্রায় বছরখানেক বাধাহীন লিভ টুগেদার করার পর দেবদ্যুতি বুঝেছে যে সে ভুল করেছিল। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে বসে সে কামক্ষুব্ধ রূপাইয়ের মন ঠিকমতো পড়তে ভুল করেছিল.......।

এগারো

বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শেষ করার দু-বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কে চাকরি জুটে যায় দেবদ্যুতির। তার বাড়িতে দুজন প্রাণী। সে আর তার মা। অনিলাও চাকরি করতেন। লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে। দেবদ্যুতির বাবা ছিলেন লাইফ-ইনসিওরেন্সেরই কর্মচারী। চাকরিতে বহাল থাকার সময়েই মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ দেবদ্যুতির মা ঐ অফিসেই চাকরি পান। বাবা মারা যাওয়ার সময় দেবদ্যুতির বয়স ছিল, বারো বছর। তার মানে কিশোর বয়স থেকেই সে মায়ের তত্ত্বাবধানে মানুষ। বাড়িতে পুষ্প নামের এক বিশ্বাসী মহিলা যাবতীয় কাজকর্ম করত। বলতে গেলে অনাত্মীয় ওই মহিলার সাহচর্যেই দেবদ্যুতির কৈশোর কাল কেটেছে। তারপর দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। সময় পালটে যাচ্ছিল। ক্রমশ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠল দেবদ্যুতি। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে চাকরি পেল। সে চাকরি পাওয়ার একবছরের মধ্যেই অনিলা অবসর নিলেন। ইতিমধ্যে বেশ বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে পুষ্পর পক্ষে এ বাড়ির সবরকম কাজকর্মের ধকল নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। প্রায় সারাজীবন পরের বাড়ি খেটে পুষ্পরও যেন বিশ্রাম দরকার ছিল। নিজের যা কিছু জমানো টাকাপয়সা নিয়ে, অনেক কান্নাকাটি করে সে ফিরে গেল তার দেশের বাড়ি এগরাতে। ঠিকে ঝি ছাড়া সর্বক্ষণের কাজের লোক আর দরকার ছিল না বাড়িতে। অনিলাই রান্নার কাজ করতে লাগলেন। সারাদিন সময় কাটাতেও তো তাঁকে হবে।

একদিন ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফিরে দেবদ্যুতি দেখল অমল মামা বসে আছেন। অনিলার দু-ভাই। একজন বরাবর পুনেতে থাকেন। সেখানেই প্রবাসী বাঙালি পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন। কলকাতায় হয়তো বছরে একবার দুবার আসেন। এলে দিদির সঙ্গে দেখা করেন। আর এক ভাই বারাসতের দিকে থাকেন। উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। অনিলার থেকে চার বছরের ছোট। এখনও অবসর নেননি। তিনি মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসেন। খোঁজখবর নিতে। দেবদ্যুতি ঘরে ঢুকতেই অনিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—খোকা শোন্ অমু কী বলছিল—।

—কী বলছ অমল-মামা?

—অফিস থেকে এসে হাত-মুখ ধোও, চা-জল খাও। তারপর শোনো। উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো খবর নয়। খবরটা ভালোই।

অনিলার হাতে তৈরি চা-জলখাবার মামা খেলেন। ভাগ্নেও খেল। তারপর কথাটা অমল বললেন দেবদ্যুতিকে। অনিলা দেবদ্যুতির বিয়ে দিতে চান। মেয়ে খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন অমলকে। মেয়ের সন্ধান এনেছেন অমল। দেবদ্যুতির

যোগ্য মেয়ে বলেই মনে হয়। অনার্স গ্রাজুয়েট। কমপিউটারে প্রশিক্ষণ আছে। চাকরিও করে কোনও এক বেসরকারি সংস্থায়। বাড়ি বাগুইআটি। দেবদ্যুতি রাজি থাকলে আগামী রবিবার মেয়ে দেখতে যেতে পারে। অবশ্য মেয়ের ফোটোও একটা এনেছেন অমল।

বিয়ের কথা শুনেই দেবদ্যুতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল—এখনও বিয়ের কথা আমি ভাবিনি।.....মানে মেনট্যালি প্রিপেয়ার্ড নই। এভাবে আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে একেবারে ফোটো এনে হাজির করেছে। অমলমামা?—এই কথাগুলোই প্রথমে বলেছিল দেবদ্যুতি। কেন যে বলেছিল জানে না। হয়তো এরকম পরিস্থিতিতে এরকম কথা বলতে হয় বলেই বলেছিল। বিয়ে কেন করবে না—এ ব্যাপারে যেমন দেবদ্যুতির যুক্তি কিংবা ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না। তেমনই বিয়ে করতেই হবে এরকম কোনও ভাবনাও তাকে তখনও পর্যন্ত তেমনভাবে আক্রমণ করেনি। আসলে এসব নিয়ে সে তেমন ভাবেনি। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনে, অন্তত নিঃশব্দ এবং নিঃসঙ্গ রাতগুলোতে বিছানায় শুয়ে ঘুমের আশায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে পাশবালিশ প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে দেবদ্যুতির ইদানিং মনে হয়, জীবনে মেয়েছেলের প্রয়োজন সত্যিই আছে; আছেই। তেত্রিশ বছরে প্রত্যেক ব্যক্তিরই গোপন যৌন-জীবন থাকা স্বাভাবিক। দেবদ্যুতিরও ছিল। তবে তা পুরোটাই যৌন-পত্রিকা-নির্ভর, কল্পনা-নির্ভর। ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের রহস্যময় এবং সন্দেহজনক বইয়ের দোকানগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে, দরাদরি করে পুরনো সেক্স-ম্যাগাজিন রীতিমতো দাম দিয়ে তাকে কিনতেই হত। সেইসব ম্যাগাজিনের ধূসর পৃষ্ঠায় বীভৎস এবং বিস্ফোরক নগ্ন-নারী-ছবি দেখে দেখে হস্তমৈথুনও করতে হয়েছে তাকে সপ্তাহে অন্তত তিন রাত। তিরিশ-উত্তীর্ণ কোনও অবিবাহিত যুবকের পক্ষে এসবই স্বাভাবিক।

অনিলা ছেলেকে বলেছিলেন, তিনি চান বিয়েটা হোক। একা থাকতে থাকতে এই বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি মনে হয়। ফিরতি যুক্তিস্বরূপ দেবদ্যুতি বলেছিল, শোনা যাচ্ছে মেয়ে তো চাকরি করে। তাহলে আর সে তোমার সঙ্গী হবে কীভাবে? তখন অনিলা রীতিমতো জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি কোনও ওজর-আপত্তি শুনতে চান না। মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে দেবদ্যুতিকে বিয়ে করতেই হবে। অনিলার আর বেশি দিন নেই। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর শরীর কমজোরি হয়ে আসছে। পৃথিবী ছাড়ার আগে তিনি নাতি-নাতনির মুখ দেখে যেতে চান।

অমল জানিয়েছিলেন মেয়ের নাম আত্রেয়ী। পালটি ঘর। ফোটো দেখে চমকে উঠেছিল দেবদ্যুতি। আত্রেয়ী তো বেশ সুন্দরী! কতটা ফর্সা সেটা জানতে ইচ্ছে হলেও মামাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়েছিল। পরের রবিবারেই তারা তিনজন, অনিলা, অমল আর দেবদ্যুতি বাগুইআটি গিয়েছিল আত্রেয়ীকে দেখতে।

আত্রেয়ীদের দোতলা বাড়িতে পা দিয়েই দেবদ্যুতির মনে হয়েছিল, পরিবারে

সচ্ছলতা আছে। বাবা, মা, দাদা-বৌদি আর ছোটভাই আছে আত্রেয়ীর। ছবিতে দেখে যেটুকু সংশয় ছিল, সামনে দেখে তা কেটে গিয়েছিল দেবদ্যুতির। ঝকঝকে ফর্সা আত্রেয়ী। মুখশ্রী বেশ ভালো। চালচলনে সপ্রতিভ। তবে বড় বেশি গম্ভীর মনে হয়েছিল আত্রেয়ীকে। যেন তার মনে কোনও ভার চেপে ছিল। কীসের ভার? আত্রেয়ীকে সামনে বসিয়ে টুকটাক কথাবার্তা চলছিল। আত্রেয়ীর বাবা এবং বৌদি কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চা, মিষ্টিমুখ সবই হয়ে যাবার পর অনিলা প্রশ্ন করেছিলেন—রান্না-বান্না জানো তো মা?

তাতে আত্রেয়ী বলেছিল—চাকরি করতে বেরিয়ে যেতে হয়। রান্না শিখব কখন? বৌদি তাড়াতাড়ি ম্যানেজ দিয়েছিলেন—একটু-আধটু সবই পারে। তারপর না হয় আপনার কাছে শিখে নেবে?

অমল দেবদ্যুতিকে বলেছিলেন—তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে না দেবু?

না-সূচক ঘাড় নাড়তে গিয়েও দেবদ্যুতির মুখ দিয়ে শেষমেশ প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছিল—কবিতা পড়েন?

—কবিতা?—আত্রেয়ী ধারালো এবং বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে দেবদ্যুতির দিকে তাকিয়েছিল—এই ইমপ্রুভড টেকনোলজির যুগে কবিতা কেউ পড়ে? উত্তর শুনে থম্ মেরে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। অনেক কথা, যুক্তি, তর্ক তার মনে কিলবিলিয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল সে। প্রশ্নটা আচমকা করে ফেলার জন্যে কীরকম বোকা বোকা লাগছিল নিজেকে। ট্যাক্সিতে তিনজনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সারারাস্তা দেবদ্যুতি ভেবেছিল যে, আত্রেয়ীকেই সে বিয়ে করবে। তারপর চরম প্রতিহিংসা নেবে। প্রতিরাতে ঘুমোতে যাবার আগে অন্তত ঘন্টাখানেক সে নানা বিখ্যাত কবির কবিতা শোনাবে আত্রেয়ীকে। একদিন নিজের ভুল স্বীকার করতেই হবে আত্রেয়ীকে। টেকনোলজির প্রগতি যতোই হোক। কবিতাকে মানুষ নির্বাসন দিতে পারবে না কোনওদিন। কবিতা কিংবা সাহিত্য মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়;—নোআর নৌকো।

দিনটা ছিল বুধবার। আত্রেয়ীকে দেখতে যাবার দুদিন পর। অফিসে বসে কাজ করছিল দেবদ্যুতি। পিয়ন এসে জানিয়েছিল ম্যানেজারবাবুর ঘরে তার ফোন আছে। ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল দেবদ্যুতির। ম্যানেজারের ঘরে তাকে কে ফোন করবে? পরিচিতরা তো তার মোবাইলে ফোন করে। তার মানে যে ফোন করেছে তার কাছে দেবদ্যুতির মোবাইল-নম্বর নেই। কিন্তু সে যে এই ব্যাঙ্কে এবং এই ব্রাঞ্চে চাকরি করে সেটা জানে। কে হতে পারে? দ্রুত উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করেছিল—কে কথা বলছেন? অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছিল থমথমে গলা, এক মহিলার। আত্রেয়ী চৌধুরী ফোন করেছিল তাকে। জানিয়েছিল সে কিছু জরুরি কথা বলতে চায়। দেবদ্যুতিকে সময় দিতে হবে। সেদিনই।

—কোথায় বলবেন কথাগুলো?

—পার্ক স্ট্রিট। মোকাম্বো কাফে। আসতে পারবেন তো?

—হ্যাঁ। দেবদ্যুতি জানাতেই—ওকে। আমি ঠিক সন্ধে ছটা থেকে ওখানে ওয়েট করব।.... এই কথা বলেই ফোন কেটে দিয়েছিল আত্রেয়ী। দেবদ্যুতি অনুভব করেছিল, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষেও তার কপালে ফুটে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কাঁটায় কাঁটায় ছটা। দেবদ্যুতি আশা করেছিল আত্রেয়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। কিন্তু প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। তবে সেও সেখানে পৌঁছনোর পর এক মিনিটও হয়নি। শুনতে পেয়েছিল আত্রেয়ীর গলা—চলুন। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল, ময়ূরকণ্ঠী-রং কামিজ আর সাদা সালোয়ারে মোড়া আত্রেয়ীকে। সেদিন ওদের বাড়িতে যা দেখেছিল তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর আর সপ্রতিভ লাগছিল আত্রেয়ীকে। দেবদ্যুতির ভালো লাগছিল। এক মুহূর্ত ভেবেছিল, এত সুন্দরী একজনকে সে স্ত্রী হিসেবে পাবে?...পাবে তো?...

কাফেতে ঢুকে কফি আর হালকা স্ন্যাকস। আত্রেয়ীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, তার তাড়া আছে। কী বলতে চায় সে? দেবদ্যুতি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—আপনাকে একটা কথা বলার জন্যেই এভাবে ডেকেছি। কথাটা বলতে ভালো লাগছে না আমার। আপনারও শুনতে ভালো লাগবে না। তবুও........বলতে আমাকে হবেই।......দেখুন আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। নিজের বুকের মধ্যে দেবদ্যুতি বিষম ধাক্কা খেয়েছিল। ধাক্কাটা সামলে নেবার চেষ্টা করতে হচ্ছিল তাকে।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না।....আপনাকে যে আমার অপছন্দ তা নয়। আসলে আমি অন্য একজনকে ইতিমধ্যেই বিয়ে করে ফেলেছি। রেজিস্টার্ড বিয়ে। অনেকদিনের মেলামেশা আমাদের।.....আমার বাড়িতে অবশ্য জানে না। তবে সন্দেহ কিছু একটা করেছে। তাই সাত-তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে নিগোসিয়েশান করে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছে।.....হিল্লোলকে ওরা পছন্দ করে না। সে এগজিকিউটিভ সার্ভিস করে তাও পছন্দ করে না। কেন বলুন তো?....থেমেছিল আত্রেয়ী। দেবদ্যুতি কী বলবে? তাকিয়েছিল।

—ওকে ওরা পছন্দ করে না কারণ ওর পদবী মণ্ডল—হিল্লোল সিডিউলড্ কাস্ট। আর আমরা ব্রাহ্মণ।...হ্যাঁ এই ২০০৪ সালেও এসব হয়। আমাদের মতো শিক্ষিত সমাজেও।.....কীরকম একটা গিলটি কনসেন্স হল। বুঝলেন? মনে হল, আপনাকে ডেকে কারণটা জানিয়ে যাই। আজ থেকে আমি আর হিল্লোল একসঙ্গে থাকতে শুরু করব। দুজনে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি।.....আজ থেকে আর বাড়ি ফিরব না। ওরা আমাদের বিয়ে মেনে নেয় নেবে, নইলে.....। কথা শেষ করেনি আত্রেয়ী। দেবদ্যুতি কিছু বলতে পারার আগেই কফি আর স্ন্যাকসের দাম মিটিয়ে উঠে পড়েছিল।—চলি—হাত নেড়েছিল। দেবদ্যুতি বুরবকের মতো ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। অচেনা সেই হিল্লোলের প্রতি ঈর্ষা হয়েছিল। আর নিজের ওপর হয়েছিল রাগ...।

বারো

এই ঘটনার সাত মাস বাদে অনিলা একদিন হঠাৎই দুপুরের দিকে চানঘরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চান করতে গিয়েছিলেন। কার্ডিয়াক অ্যাটাক। ভাগ্যিস সেদিন কাজের মেয়ে দেরি করে এসেছিল। বাসন মাজছিল কিচেনে। পড়ে যাবার সময় অনিলা অস্ফুটে চিৎকার করে উঠেছিলেন। সেই চিৎকার শুনে কাজের মেয়ে ছুটে যায়। দরজায় বার বার ধাক্কা দিতে থাকে। দরজা কে খুলবে? অনিলা তখন অচৈতন্য। কাজের মেয়ে আশেপাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশীদের ডেকে এনেছিল। দেবদ্যুতির মোবাইল নাম্বার ছিল প্রতিবেশীদের একজনের কাছে। খবর পেয়ে সে দ্রুত চলে আসে। তারপর পৌরসভার অ্যাম্বুলেন্স। কোঠারি হাসপাতাল। আই. সি. ইউ। পনেরো দিন বাদে যখন অনিলা বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁকে সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হত। হাঁটাচলা বন্ধ। বিছানাতেই বেডপ্যানে প্রাতঃকৃত্য। রক্তে চিনির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। হার্টের অবস্থাও ভালো নয়। এরকম এক বিপদের সময়েই তাপসীর আগমন হয়েছিল এই বাড়িতে।

সর্বক্ষণের নার্স চাই এই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল দেবদ্যুতি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাপসী এসেছিল। সেদিন ছিল ছুটির দিন। তাপসীকে দেখে বেশ ভদ্র মনে হয়েছিল দেবদ্যুতির। নার্সিং ট্রেনিং-এর সার্টিফিকেটও দেখিয়েছিল সে। বাড়িতে রুগীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতে তার কোনও আপত্তি ছিল না। সে জানিয়েছিল যে সে অবিবাহিত। কিন্তু কথাটা তো ছিল জলজ্যান্ত মিথ্যে। অশ্বিনীর সঙ্গে তার সামাজিকভাবে পাঁচজনের সামনে বিয়ে হয়নি। সরকারি রেজিস্টারের সামনেও সই করে বিয়ে হয়নি। কালীঘাটের মন্দিরে পান্ডা এবং পুরোহিতের সহায়তায়, অশ্বিনীর বন্ধু সেই জঘন্য লোকটা, হেমন্তবাবুকে সাক্ষী রেখে তো অশ্বিনী তাপসীর সিঁথিতে সিঁদুর লেপে দিয়েছিল। সেটা কি বিয়ে নয়? সে বিয়েকে অস্বীকার করার সাহস তো হয়নি তাপসীর। তার আগে সহবাসও সে করেছে অশ্বিনীর সঙ্গে প্রায় বছরখানেক। ঠিকমতো বলতে গেলে সহবাস শুরু হয়েছে কালীঘাটের ব্যাপারটার অনেক আগে থেকেই। কুমারী অবস্থাতেই উপর্যুপরি সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল তাপসী। লোকলজ্জার বিপদ থেকে বাঁচতেই কালীঘাটে বিয়ে করে দুজনে। লোকলজ্জার ভয় আসলে ছিল তাপসীরই। অশ্বিনী তাকে স্ত্রী হিসেবে না মেনে নিতেও পারত। কিন্তু মেনে নিয়েছিল। কেন?....সেটা পরে বুঝেছিল তাপসী। অশ্বিনী ছিল অনেক উঁচুদরের বজ্জাত।

দেবদ্যুতি জানতে চেয়েছিল—বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমাদের বাড়িতে আপনি

সবসময়ের জন্যে থাকতে পারবেন?

—থাকব বলেই তো এসেছি।...সে অর্থে আমার বাড়ি নেই।

—মানে?

—আমি মেয়েদের হস্টেলে থাকি। বড়িশার কাছে। ঠিকানা দিতে পারি। খোঁজ নিয়ে দেখতে চান?

খোঁজ নেবার দরকার মনে করেনি দেবদ্যুতি। বরং তার মনে হয়েছিল মেঘ না চাইতেই সে জল পেয়ে গেছে। এমন একজন নার্স, যার পিছুটান নেই। সংসারের টান নেই। এতো আদর্শ ব্যবস্থা! তাপসী কাজে বহাল হল। বাড়ির একজনের মতো থাকা। খাওয়া-দাওয়া। আর দেড় হাজার টাকা মাইনে। অনিলার ঘরেই শুত তাপসী। রাত এগারোটা বাজলেই দরজা বন্ধ করে দিত। ক্রমে দেখা গেল, বাড়ির রান্নাবান্নার দায়িত্বও তাপসী নিয়েছে। পাঁচশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল দেবদ্যুতি। অনিলারও বেশ পছন্দ মেয়েটিকে। সারাদিন তাঁর দেখাশোনা করে তাপসী। খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। গল্পের বই পড়েও শোনায়। দেবদ্যুতিকে কিছু ভাবতে হত না। সকাল নটাতে সে বেরিয়ে যেত অফিসে। বাড়ি ফিরত রাত দশটার পর। টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখত তাপসী। টুকটাক দু-একটা কথাবার্তা, মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করার পর, মা জেগে থাকলে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তার পর টেবিলে এসে একা একা খেয়ে নিত দেবদ্যুতি। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। একঘন্টা বই পড়া কিংবা টিভি দেখার পর বিছানা।

তাপসী কেন বলেছিল সে অবিবাহিত? দেবদ্যুতি যদি জানতই যে অশ্বিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে এখন অশ্বিনীর সঙ্গে থাকে না। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের হোস্টেলে থাকে। তাহলে কি এ বাড়িতে কাজে বহাল হতে কোনও অসুবিধে হত? কেন হবে? দেবদ্যুতি একজন দক্ষ নার্স চেয়েছিল মাত্র। অবিবাহিত সেবাদাসী তো চায়নি। তবুও তাপসী মুহূর্তের ঝোঁকেই হয়তো নিজের জীবনের আসল কথাটা গোপন করেছিল। তার জন্যে খেসারতও দিতে হল তাকে। সেই খেসারতের পরিণাম ভয়ঙ্কর।...

তাপসী যে শুধুমাত্র কর্তব্যমগ্ন একজন নার্স নয়। প্রবল যৌবনবতী একজন নারীও, এটা প্রথম দেবদ্যুতির মনে হয়েছিল এ বাড়িতে সে কাজে বহাল হবার প্রায় তিন মাস পর। একদিন সে চানঘরে ঢুকে দেখেছিল সাদা মতো কী একটা রয়ে গেছে সিমেন্টের তাকে, যেখানে সাবান, তেল ইত্যাদি থাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যান্ডেজের ফালি।

পরে ভালোভাবে দেখে বুঝেছিল একটা স্যানিট্যারি ন্যাপকিন। অব্যবহৃত তখনও। ধবল প্যাড। নীলচে পাতলা কাগজের আঁশ লেগে আছে। হয়তো ব্যবহার করতে হবে মাসের সেই দিন থেকেই,—এই আশঙ্কায় প্রতি মাসেই অধিকাংশ মেয়েকেই এই আশঙ্কায় তটস্থ থাকতে হয়, তাই নয় কি? তাপসী বস্তুটি স্নান করার সময় চানঘরে

নিয়ে এসেছিল, এবং যেহেতু তখনও ব্যবহার করার মতো অবস্থা হয়নি, তাই ব্যবহার করেনি। অন্যমনস্কতায় ফেরত নিয়ে যেতেও ভুলে গেছে।

স্যানিটারি ন্যাপকিন, অব্যবহৃত, ফ্রেশ, এত কাছ থেকে দেখেনি দেবদ্যুতি। টিভির বিজ্ঞাপনে তো প্রায়ই দেখতে হয়। সে সেটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিল, অনুভব করেছিল বস্তুটির পেলব-নরম মসৃণতা, যা একান্তই গোপনীয় এবং মেয়েদের নিজস্ব। চানঘরের নিষিদ্ধ নির্জনতায় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটা টাটকা, ব্যবহার-উন্মুখ স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেবদ্যুতি সেই প্রথম কল্পনায় নিজের অভিলাষ মতো নগ্ন করেছিল তাপসীকে। সেই প্রথম তার মনে হয়েছিল তাপসীর বুকদুটো বড় করে আঁকা সেজানের আপেলের মতো। তার নিতম্বে জলের কুঁজোর গভীরতা। এক বাড়িতে পাশাপাশি বাস করছে তাপসীর সঙ্গে দেবদ্যুতি। অথচ তাকে টোনা মেরে দেখতে ইচ্ছে হয়নি কেন এতদিন? নিজের ভেতরের থরেথরো উত্তেজনা প্রশমিত করে, শাওয়ারের নীচে শরীরকে ঠাণ্ডা করে সে বেরিয়ে এসেছিল। দেখেছিল তাপসী কীরকম অপরাধী মুখ করে দাঁড়িয়েছিল পারলারে। তাকে দেখে যেন লজ্জা পেয়েছিল। মিনিট পনেরো বাদে চানঘরে আবার ঢুকে দেবদ্যুতি দেখেছিল স্যানিটারি ন্যাপকিন উধাও।

সেদিন রাতেই প্রথম তাপসীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক শুরু হয় দেবদ্যুতির। রাত এগারোটার পর। অনিলা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর খাটের পাশে মাটিতে আলাদা বিছানায় তাপসীও বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল। বন্ধ দরজাতে মৃদু ধাক্কা দিয়েছিল দেবদ্যুতি।...কে?....কী ব্যাপার? তাপসী জানতে চেয়েছিল। দেবদ্যুতি নীচু স্বরে জানতে চেয়েছিল—মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?—হ্যাঁ।—আপনি একবার দরজাটা খুলবেন? আমার ঘরে একটা বিছে বেরিয়েছে। কোথায় যে সেঁদিয়ে গেল!—সে কী বিছে!—বলে সত্যিই বেশ উদ্বিগ্ন মুখে শুধুমাত্র পাতলা ম্যাক্সি-পরিহিত তাপসী দরজা খুলেছিল এবং দেবদ্যুতির সঙ্গে তার ঘরে এসেছিল। একেবারেই সময় নষ্ট করতে চায়নি দেবদ্যুতি। জড়িয়ে ধরেছিল তাপসীকে।—একী করছেন? বললেন যে বিছে? দেবদ্যুতি কোনও উত্তর দেয়নি। একটানে তাপসীর ম্যাক্সির ফিতে খুলে দিয়েছিল। যেন লাফিয়ে, তার লোভী চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল দুটো ভীষণ ভরাট ও নিটোল স্তন। বিভাজিকার উপত্যকায়, বাদামি স্তনবৃন্তে নিজের জিভ উন্মাদের মতো ঘষতে ঘষতে দেবদ্যুতি অস্ফুটে বলেছিল—তুমি আনম্যারেড। তোমাকে আমি বিয়ে করব। দেবদ্যুতির দুর্দান্ত দস্যুপনায় ক্রমশ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যেতে যেতে তাপসী বলেছিল—আপনার মা মেনে নেবে আমাকে?

—খুব নেবে। তুমি ছাড়া মা একমুহূর্ত পরিষ্কার থাকতে পারবে না।...বাঁচতে পারবে না।

দেবদ্যুতির ভাগ্যে সেই প্রথম নারীশরীর। সে ঘর অন্ধকার করে টর্চ জ্বেলে তাপসীর যোনিপ্রদেশ দেখতে চেষ্টা করেছিল। যেন বুঝে নিতে চাইছিল সেই গভীর ও সজল সুড়ঙ্গের যাবতীয় রহস্য। তাপসী ছটফট করছিল বিছানায় শুয়ে।

বলেছিল—কী পাগলামি করছেন? এতটা দস্যু আপনি?

—এত ঐশ্বর্য তোমার? আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব...। উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে অস্ফুটে বলেছিল দেবদ্যুতি। তারপর নিজের উত্তুঙ্গ শিশ্নদণ্ড নিয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে; তখন নিজেকে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে তাপসী বলেছিল—দাঁড়ান।... বাড়িতে কনডোম আছে?

—না তো...।

—তাহলে? কিছু যদি হয়ে যায়? কে সামলাবে? বিয়ে তো করেননি এখনও আমাকে।

—কিন্তু আমি যে আর পারছি না...

—আপনাকে শান্ত করার উপায় আমার জানা আছে...আসুন। সেই প্রথম। স্বর্গীয় আনন্দের অনুভব দেবদ্যুতির।

তারপর প্রায় প্রতি রাতেই। অবশ্যই সতর্কতাসহ। তাপসীই সব শিখিয়ে দিয়েছিল দেবদ্যুতিকে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও নির্ভুলভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত সে, তাপসীই। এরকম তমুল প্রেমপর্ব কিংবা শরীরপর্ব যখন চলছিল দুজনের, মাঝে মাঝেই তাপসীর মনে হয়েছিল সে ঠকাচ্ছে দেবদ্যুতিকে। অশ্বিনী তো এখনও যোগাযোগ রাখে তার সঙ্গে। টাকা চাইতে আসে প্রায়ই। যতদিন অনিলা বেঁচে ছিলেন, অশ্বিনীর সঙ্গে বাইরে দেখা করত তাপসী। ফোনে অশ্বিনী তাকে নির্দেশ দিত কোনও একটা জায়গায় আসতে। নির্দেশ?.....হ্যাঁ, নির্দেশই তো। প্রতিবারই টাকা অশ্বিনীর হাতে তুলে দেবার সময় তাপসী বলত—এভাবে কতদিন ব্ল্যাকমেল চালাবে তুমি? অশ্বিনী হাসত—ব্ল্যাকমেল বলছ কেন? স্বামী যেমন স্ত্রীর ভরণপোষণ করে সেরকম স্ত্রীরাও তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামীদের ভরণপোষণ করে। তাপসী বলত—এভাবে প্রতিমাসে নিয়ম করে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কত টাকা পাই আমি? তোমারও তো চাহিদার শেষ নেই। হেমন্তবাবুর অফিসে যে ফাই-ফরমাশ খাটো টাকা পাও না? নিজের জন্যে কত টাকা লাগে? শুধু মদ গিললে তো অভাব হবেই। অশ্বিনী বলত—হেমন্ত শালা বজ্জাত একটা। তিন হাজার টাকার বেশি কিছুতেই দেয় না। আর শুতে পাই ওর অফিসে রাতে। এভাবে চলে?....কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকত অশ্বিনী। তারপর মিচকে হেসে বলত—তাহলে কি এবার থেকে সরাসরি দেববাবুর কাছে টাকা চাইব? একদিন ওঁর ব্যাঙ্কে গেলেই হয়......? পরিষ্কার ইঙ্গিত। তাপসী কেঁপে উঠত। দেবদ্যুতি যদি শোনে সে বিবাহিতা। তাহলে মিথ্যে বলার অপরাধে তাকে কি রাখবে বাড়িতে? যদি তাড়িয়ে দেয় তাহলে কোথায় যাবে তাপসী? কে তাকে আশ্রয় দেবে? সুতরাং অশ্বিনীকে রাগানো যাবে না কোনওমতেই।

একদিন অনিলাও চলে গেলেন। দ্বিতীয় স্ট্রোক। মৃত্যু এসেছিল অতর্কিতে। ঘুমের মধ্যে। তাঁকে কোনও যন্ত্রণা না দিয়ে। তাপসী এ বাড়িতে রয়ে গেল। দেবদ্যুতি আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ল তার ওপর।

তেরো

অনেক বছর আগে অশ্বিনীর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন লোকটাকে এত খারাপ মনে হয়নি। তার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে তাপসীর। সব মেয়েরই কি এরকম মনে থাকে? বিশেষত যখন অশ্বিনী হল তার জীবনে প্রথম পুরুষ।

নার্সিং ট্রেনিং শেষ করে বাড়িতে বসে ছিল তাপসী। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যেতে হত তাকে যে কোনও রকম একটা চাকরির ধান্দায়। একবার আলিপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে যেতে হয়েছিল তাকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ঐ সরকারি অফিসে কিছু নার্সদের নিয়োগ করা হবে। ঐ অফিসে গিয়ে জেনেছিল অফিসারের সঙ্গে দেখা হবে না। চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনপত্র নেবার জন্যে একটা বাক্স রাখা আছে অফিসে ঢোকার মুখে। তালাবন্ধ সেই বাক্সের ফাঁক গলিয়ে আবেদনপত্র ফেলে দিলেই হবে। তাই করেছিল তাপসী। তারপর ভবানী ভবনের বিপরীত দিকের ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছিল ফেরার বাসের অপেক্ষায়। পর পর বেশ কয়েকটা বাস ছেড়ে দিয়েছিল তাপসী। ভীষণ ভিড়ে উঠতে পারেনি। তারপর একটা বাসে কোনওরকমে ঠেলেঠুলে উঠতে গিয়ে কাঁধের ব্যাগের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাস চলতে শুরু করেছে। তাপসী বাসের ফুটবোর্ডে। কিন্তু তার ব্যাগ রাস্তায়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বাস থামাতে বলেছিল তাপসী। অন্য যাত্রীরাও হৈ চৈ শুরু করেছিল। থেমে গিয়েছিল বাস। তাপসী ছুটে গিয়ে দেখেছিল, মাঝারি উচ্চতার, বেশ শীর্ণকায় একজন লোক তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোকটাই অশ্বিনী। তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল তাপসী। তারপর কী করবে বুঝতে পারছিল না। ইতিমধ্যে অশ্বিনী তাকে বলেছিল—আপনি খুব নার্ভাস হয়ে গেছেন। কদ্দুর যাবেন? তাপসী জানিয়েছিল সে হাওড়া যাবে। হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়েছিল অশ্বিনী। তাপসীকে বলেছিল—উঠে আসুন। ব্যাপারটা এত অতর্কিতে ঘটেছিল যে তাপসী আপত্তি করবার কোনও ফুরসুতই যেন পায়নি। সে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল। তাকে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে অশ্বিনী হেসেছিল। তাপসী আড়ষ্টভাবে বলেছিল—সত্যি আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব। অশ্বিনী হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল—আবার কবে দেখা হবে? এরকম প্রশ্নে ভীষণ চমক খেয়েছিল তাপসী। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তখন অশ্বিনীই হেসে বলেছিল—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব হেল্পলেস।...আমাদের দেখা হওয়া দরকার। আগামীকাল বিকেল চারটে থেকে

আমি এই হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির নীচে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আসবেন তো?....অশ্বিনীর কথাগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো নিজের ভরকেন্দ্র থেকে ছিটকে দিয়েছিল তাকে। একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল অচেনা এক যুবকের থেকে এরকম মর্মভেদী পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাব। সে তো সত্যিই অসহায় ভাবত নিজেকে তখন। তেইশ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও প্রেম আসেনি জীবনে। দাদার গলগ্রহ। বিয়ে কবে হবে, কোথায় হবে সব অনিশ্চিত ছিল।

প্রথমদিন একটা মাস্টারস্ট্রোকেই অশ্বিনী কাত করে দিয়েছিল তাপসীকে।

শুরু হয়েছিল অশ্বিনীর সঙ্গে তার উত্তাল, আবেগময়, সংরাগময়, প্রবলভাবে—শরীরী সম্পর্ক।

অশ্বিনী বলেছিল সে একটা বেসরকারি অফিসের সেলস ম্যানেজার। অফিস না বলে সেটাকে ইলেকট্রনিক গুডসের বড় দোকান বলাই উচিত। তার পোশাক-আশাক, কথাবার্তা থেকে তাপসীর মনে হয়েছিল অশ্বিনীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোই। প্রায়ই হোটেল রেস্তোরাঁয় তাকে নিয়ে যেত অশ্বিনী। অবাধে পয়সা খরচ করত। তখন যেন স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তাপসী। বাস্তবের সঙ্গে যেন সম্পর্কই ছিল না কোনও। অশ্বিনী বলেছিল, তারা বিয়ে করে প্রথমে যাবে কুলুমানালি—হানিমুনে। তারপর ফিরে আসবে কলকাতায়। যোধপুর পার্কে নাকি একটা ফ্ল্যাট কিনতে চলেছে সে। কথাবার্তা চলছে। সেই ফ্ল্যাটে দুজনে সংসার পাতবে। নিজের বাড়ির কথা তেমন বলত না অশ্বিনী। শুধু বলেছিল, সে নাকি খুব কষ্টে মানুষ। তিন ভাই, এক বোন। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা শহরে তার বাড়ি। বাবা মারা গেছে ছোটবেলায়। মা বেঁচে আছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য দু-ভাই গ্রামের বাড়িতেই চাষ-আবাদ নিয়ে থাকে। অশ্বিনী গ্র্যাজুয়েশনের পর কলকাতায় চলে এসেছে নিজের ভাগ্যের সন্ধানে। সেলসের কাজ সে ভালো বোঝে। নিজে কমার্সের ছাত্র। বেসরকারি অফিসে সেলস-ম্যানেজারি সে করছে বটে। কিন্তু যেহেতু সে বাজারটা বোঝে। তাই তার লক্ষ্য হল, নিজেই একটা ব্যবসা শুরু করা। একদিন ম্যাডান স্ট্রিটে নিজের অফিসে তাপসীকে নিয়ে গেল অশ্বিনী। তার বস্ হেমন্ত সরকারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ছোট অফিস। তবে বেশ সাজানো। অফিসের লাগোয়া সেলস কাউন্টার এবং গো-ডাউন। দেখে ভালোই মনে হয়েছিল তাপসীর। শুধু একটা ব্যাপারে কীরকম খটকা লেগেছিল। হেমন্তবাবুর অফিস-চেম্বারে তাকে বসিয়ে রেখে অশ্বিনী হঠাৎ 'একটু আসছি' বলে কোথায় যে চলে গিয়েছিল! আর হেমন্তবাবু তার দিকে কীরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাপসীর। যে কোনও মেয়েই পুরুষের চাহনির অর্থ চট করে বুঝে নিতে পারে। হেমন্তবাবুর দৃষ্টি তার আদৌ ভালো লাগেনি। যেন শাড়ি ব্লাউজ ভেদ করে সেই দৃষ্টি তাপসীর শরীরের গোপনে বিঁধছিল।

আসলে তাপসী নিদারুণ সত্যিটাই ধরতে পারেনি। সব বানিয়ে বলেছিল

অশ্বিনী। নিজের সম্বন্ধে কিছুই সে সত্যি বলেনি। কোনও চাকরিই তার ছিল না। হেমন্ত সরকার আসলে তার বন্ধু। অনেকদিনের বন্ধু। শুঁড়িখানার বন্ধু। গণিকালয়ের বন্ধু। হেমন্ত দয়া-দাক্ষিণ্য করত তাকে। দোকানে ফাই-ফরমাস খাটত অশ্বিনী। রাতে পাহারা দেবার জন্যে দোকানে শুত। বিনিময়ে নিজের খাওয়া-খরচ চালাবার মতো টাকা পয়সা পেত সে। এছাড়াও অশ্বিনী প্রেমোটারদের হয়ে দালালি করত। তাতে কিছু পয়সা আসত হাতে।

একদিন দুপুরে একটা মাঝারি মানের হোটেলের ঘরে অশ্বিনী নিয়ে এসেছিল তাপসীকে। অশ্বিনীর অভিনয় এত নিখুঁত ছিল যে, তাপসী পুরোপুরি তার কাছে নিজেকে যেন সমর্পণ করেছিল। একেই বোধহয় বলে মন্ত্রমুগ্ধ। সেই হোটেলের ঘরে প্রথম যৌন-সম্পর্ক হয়েছিল অশ্বিনীর সঙ্গে। হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তাপসীর। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অশ্বিনী তাকে ভালোবাসে। সে তাকে ঠকাতে পারে না। কুমারী অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়েছিল তাপসী।

দেখা গেল অশ্বিনী তাকে ঠকাল না। সব শুনে বলল তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু এ কীরকম বিয়ে? রেজিস্ট্রি-অফিসে নোটিশ দিল না অশ্বিনী। বলল পরে রেজিস্ট্রি করে নেবে। আপাতত কালীঘাটে মায়ের সামনে সে সিঁদূর লেপে দেবে তাপসীর সিঁথিতে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেবে তাদের। এভাবেও তো বিয়ে হয় কতজনের। হয় না কি?

কালীঘাটে তাদের বিয়েতে একমাত্র সাক্ষী ছিল হেমন্ত সরকার। কালীঘাট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাপসী আর অশ্বিনী গিয়েছিল তাপসীর বাড়িতে। তাপসীর সিঁদূর চিহ্ন দেখে এবং তার মুখে সব শুনে মা মূর্ছা গিয়েছিল।

আর তাপসীর দাদা আক্ষরিক অর্থেই বোনকে আর অশ্বিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। বলেছিল—আর কোনওদিন এ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করবে না তোমরা। কালীঘাটে বিয়ে? আমরা মানি না। আজ থেকে জানব আমার বোন মরে গেছে। ঝোঁকের মাথায় তাপসীও পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। অশ্বিনীর হাত ধরে সে নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

অশ্বিনী তাপসীকে নিয়ে চলে এসেছিল হেমন্তবাবুর দোকানে। সব শুনে হেমন্তবাবু বলেছিল—দুশ্চিন্তা করবার কোনও দরকার নেই। এন্টালির দিকে তার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে থাকবে অশ্বিনী আর তাপসী।

ছোট দু-কামরার ফ্ল্যাট। খাট-বিছানা সবই ছিল সেখানে। কিচেনে গ্যাস-সিলিন্ডার, বাসন-কোসন, ডাইনিং স্পেসে খাবার টেবিল তাও ছিল। দেখে ভালো লেগেছিল তাপসীর। হেমন্তবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল মন।

কিন্তু এক সপ্তাহের দাম্পত্য-জীবন কাটতে না কাটতেই একদিন যা ঘটল তা তাপসীর পক্ষে মর্মান্তিক। অশ্বিনী বাড়ি ছিল না। রাত আটটা নাগাদ ডোর বেল

বেজেছিল। তাপসী দরজা খুলে দেখেছিল হেমন্তবাবু। কীরকম জড়ানো স্বরে কথা বলছিল লোকটা। মদের গন্ধ বের হচ্ছিল মুখ দিয়ে। খুব অস্বস্তির সঙ্গে তাপসী বসতে বলেছিল হেমন্তবাবুকে। বাইরের ঘরে হেমন্তবাবু বসেছিল। আর তাপসী দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল কখন অশ্বিনী আসে তার আশায়। একসময় হেমন্তবাবু—'এই যে শুনছেন' বলে ডেকেছিল তাপসীকে। হয়তো জল কিংবা চা চাইছে লোকটা এই ভেবে তাপসী যেই ঢুকেছে ঘরে, হেমন্তবাবু চেয়ার থেকে উঠে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। পাগলের মতো ঠোকরাচ্ছিল। ব্লাউজের বোতাম গুলো পট্‌পট করে খুলে ফেলেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তাপসী। তারপর সে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ঠেলে দিয়েছিল হেমন্তবাবুকে। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল হেমন্তবাবু। আর সেই সুযোগ তাপসী ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল নীচে রাস্তায়, ফুটপাতে।

আলুথালু বেশে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তাপসী এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেয়েছিল অশ্বিনীকে। একটু দূরে পান-সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল অশ্বিনী। তার হাতে সিগারেট জ্বলছিল। তাপসীকে দেখে এগিয়ে এসেছিল অশ্বিনী। আর ভাঙা গলায় তাপসী বলেছিল—ওগো তোমার বন্ধু হেমন্তবাবু বজ্জাত লোক একটি! মদ গিলে আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে অসভ্যতা.....পুরোটা বলতে পারেনি তাপসী। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আশেপাশের লোকজন তাকাচ্ছিল তার দিকে। অশ্বিনী তাড়াতাড়ি তাপসীকে নিয়ে এসেছিল নিজের ফ্ল্যাটে। উদ্বেগহীন, ঠাণ্ডা স্বরে জানতে চেয়েছিল—হেমন্তবাবুকে কি সে অপমান করেছে?

অশ্বিনীর প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল তাপসী। আরও অবাক হয়েছিল যখন অশ্বিনী বাইরের ঘরে বসে থাকা হেমন্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কিছু মনে কোরো না হেমন্তদা। আমি ওকে সব বলে দিচ্ছি।

হেমন্তবাবু জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছিল—আজ মাগীর ব্যবহার দেখে মনে হল কিছুই ব্রিফ করা হয়নি ওকে। আমি এত ইনভেস্ট করলাম এমনি এমনি? আজ উঠচি। আগামীকাল এই সময় আসব। তখন যদি মাগী বেগড়-বাঁই করে তো দেখবে কী করি...। শালী এমন ঠেলা দিয়েছে পড়ে গিয়ে কোমরে লেগেছে মাইরি। কাল এসে দেখব ওর ফণার কত তেজ!

হেমন্তবাবু চলে গিয়েছিল। আর মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাপসীর কাছে। হেমন্তবাবুর মাইনে করা চাকর হল, অশ্বিনী। এতদিন ধরে তাহলে শুধুই অভিনয় করে গেছে সে তাপসীর সঙ্গে। তার প্রেম, প্রতিশ্রুতি, কালীঘাটের মন্দিরে বিয়ে সব মিথ্যে, বানানো! তাপসীকে আসলে হেমন্তবাবুর রক্ষিতা করতে চেয়েছে অশ্বিনী। উঃ কী জঘন্য! তাপসী বুঝেছিল সে প্রতারিত হয়েছে। না বুঝে পাতালের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু সামান্য একটু আশ্রয় এবং ভাত-কাপড়ের জন্যে

তো অশ্বিনীর সঙ্গে এই ঘৃণ্য জীবন মেনে নেওয়া যায় না। তার বুক ভেঙে গিয়েছিল। মাটি সরে গিয়েছিল পায়ের তলা থেকে এটা ঠিক। কিন্তু তবুও সে শয়তান অশ্বিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বিশ্রি ঝগড়া এবং মারামারির মধ্যে সেই রাতটা কেটেছিল। তাপসী আঁচড়ে দিয়েছিল অশ্বিনীর মুখ। অশ্বিনী যখন হাত তুলে মারতে উদ্যত হয়েছিল তখন তাপসী তার হাতে কামড়ে দিয়েছিল। বিনিময়ে অশ্বিনীও কিছু কম করেনি। চুলের মুঠি ধরে তাপসীকে আছড়ে দিয়েছিল মাটিতে। তারপর পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে অশ্বিনী হিসহিসিয়ে বলেছিল—আর বজ্জাতি করলে তোর নলিটা কুচ করে কেটে দেব।

পরের দিন সকালে যখন অশ্বিনী একটু বেরিয়েছিল, নিজের সুটকেশটা নিয়ে হেমন্তবাবুর দাক্ষিণ্যে পাওয়া ফ্ল্যাট ছেড়েছিল তাপসী। সোজা চলে এসেছিল অশোকনগর। সেখানে তার এক পিসতুতো দিদি থাকত পারমিতা। তাপসীর থেকে দু-এক বছরেরর বড়। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল পারমিতা। এক ছেলে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ত। নিজের দু-ঘরের বাড়িতে একাই থাকত পারমিতা। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করত। আর করত পার্টি। স্থানীয় মহিলা সংগঠনের নেত্রী ছিল সে। পারমিতার সঙ্গে বেশ বনত তাপসীর। কারণ পারমিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট আধুনিক। তার চরিত্রে ছিল দৃঢ়তা। শুধুমাত্র একজন মেয়ে হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে এই পুরুষ-প্রধান সমাজের একরাশ প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছিল পারমিতা। সে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল তাপসীকে। তাপসী চোখে তখন অন্ধকার দেখছে। তার পেটে অশ্বিনীর সন্তানের ভ্রূন। দেড় মাস। কিন্তু অশ্বিনী নামের ঐ নররাক্ষসের কাছে তাপসী আর ফিরবে না। ঘৃণ্য বারবনিতার জীবন থেকে অভাবগ্রস্থ এবং অনিশ্চিত একার জীবনকেই সে বেছে নিয়েছিল। নিজের বাড়িতেও সে আর ফিরতে চায় না। দাদা তাকে বলেছিল—তুই যে আমাদের বাড়ির কেউ তা আমরা আর মনে রাখতে চাই না। মা প্রতিবাদ করেনি। শুধু বিনবিনিয়ে কেঁদেছিল। সুতরাং সেই বাড়িতে নিজের কলঙ্কের কালি মেখে কীভাবে ফিরবে তাপসী? পারমিতা তাকে সাহায্য করেছিল প্রকৃত মানবীর মতো। নিজের একজন পরিচিত ডাক্তারের কাছে সে নিয়ে গিয়েছিল তাপসীকে। নির্বিঘ্নে ভ্রূণমুক্ত হয়েছিল তাপসী। তারপর পারমিতার চেষ্টাতেই একটা চাকরি পেয়ে গেল তাপসী। পারমিতার বান্ধবীর একটা বুটিকের দোকান ছিল সল্ট লেকের অভিজাত এলাকায়। বেশ চালু এবং বড় দোকান। সেখানে একজন সেলস গার্ল খোঁজা হচ্ছিল। পারমিতার অনুরোধে তার বান্ধবী তাপসীকে দোকানে চাকরি দিল। বারোশ টাকা মাইনে। আর থাকার ব্যবস্থা হল উল্টোডাঙ্গার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে। থাকা এবং খাওয়া বেশ সস্তাই ছিল সেখানে। এভাবে শুরু হয়েছিল তাপসীর স্বাধীন জীবন। সেই জীবনে অভাব ছিল, লড়াই ছিল; আবার লড়াইয়ের আনন্দও ছিল। মাত্র কয়েক মাস অবশ্য চাকরিটা করতে লড়াইযের আনন্দও ছিল। মাত্র কয়েক মাস চাকরিটা করতে হয়েছিল

এবং হস্টেলে থাকতে হয়েছিল তাপসীকে। তারপর একদিন তার চোখে পড়েছিল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেবদ্যুতির দেওয়া বিজ্ঞাপন। ভাগ্যিস নার্সিং-প্রশিক্ষণটা নেওয়া ছিল। দেবদ্যুতির বাড়িতে বহাল হল তাপসী। যদিও মিথ্যে পরিচয়ে। তাপসী ওদের জানিয়েছিল সে অবিবাহিত। তার কোনও সাংসারিক পিছুটান নেই। একজন স্বাধীনচেতা মেয়ে হিসেবে একা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে।

বেশ চলছিল। তখনও অনিলা বেঁচে। যদিও দেবদ্যুতির সঙ্গে তাপসীর গোপন যৌন জীবন শুরু হয়ে গেছে। একদিন অনিলা দুপুরের ঘুমে তলিয়ে ছিলেন। তাপসী একা একা বসে টিভি সিরিয়াল দেখছিল। সেই নির্জন এবং প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরেই হঠাৎ ডোর বেল বেজেছিল। কে হতে পারে? কোনও সেলস-গার্ল? তাপসী দরজা খুলে দেখেছিল অশ্বিনী। চমকে উঠেছিল সে। কিন্তু কিছু করার ছিল না। কীভাবে অশ্বিনী তার সন্ধান পেয়েছিল সে বলতে পারবে না। তবে ঐ শয়তানের পক্ষে সবই সম্ভব। বাড়িতে ঢুকেছিল অশ্বিনী। প্রথমে ঠাণ্ডা সরবত তারপর চা দিতে হয়েছিল তাকে। চা ও বিস্কুট খেয়ে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল অশ্বিনী। তারপর বলেছিল—আমার কিছু টাকা লাগবে। বাঞ্চোত হেমন্তর সঙ্গে রিলেশান ভালো যাচ্ছে না। ঐ লোকটার দালালি করা ছেড়ে দেব ভাবছি।.....তারপর তাপসীর দিকে তাকিয়ে ফিচেল হেসে বলেছিল—তোমার রূপ বেশ খুলেছে মাইরি। ভালো আছো বোঝা যায়। পেটের বাচ্চাটাকেও খসিয়েছ নিশ্চয়? তাপসী দাঁতে দাঁত টিপে বলেছিল—এতদিন বাদে আমাকে জ্বালাতে এলে কেন? কী মতলব?

অশ্বিনী তাকে টাকার কথা বলেছিল। তাপসী তাড়াতাড়ি পাঁচশ টাকা দিয়ে বলেছিল—এখানে আমাকে বিরক্ত করতে আর আসবে না। আমি সব ভুলতে চাই। নিজের পেটেন্ট শয়তানি হাসিটা হেসে অশ্বিনী বলেছিল—ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? এই ভদ্দরলোকদের বাড়িতে নিশ্চয়ই তোমার অতীতের কথা বলনি?....আমি জানি বলতে পারবে না। বললে এ বাড়ির অন্দরমহলে গেড়ে বসবার এই চাকরিটা পেতে না।...যাই হোক, আমিও এদের কিছু বলতে চাই না। তবে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আসব। টাকাপয়সার দরকার হলে.....।

সেদিন চলে গিয়েছিল অশ্বিনী। তবে তারপর থেকে প্রায়ই আসত। অন্তত নিয়ম করে মাসে দুবার। শুরু হয়েছিল অশ্বিনীর সঙ্গে তাপসীর এক গোপন বোঝাপড়ার জীবন। নিজের মাইনে এবং সঞ্চয়ের টাকা থেকে সে অশ্বিনীর চাহিদা মেটাত। তারপর যখন অনিলা মারা গেলেন এবং দেবদ্যুতি পুরোপুরি নির্ভর করতে চাইল তাপসীর ওপর; এমনকী প্রতি মাসের সংসার খরচের টাকাও সে তুলে দিতে লাগল তাপসীর হাতে; তখন সেই টাকা থেকেও কিছু কিছু টাকা সরিয়ে অশ্বিনীর চাহিদা সামলাতো তাপসী। এভাবেই মুখ বন্ধ করে রেখেছিল তার। মাঝে মাঝে মনে হত, ক্রমশ এক নিষিদ্ধ এবং বিপজ্জনক জটিলতার আবর্তে আমূল আটকা পড়ে যাচ্ছে। এই আবর্ত থেকে তার স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই। বদমাশ অশ্বিনী

তাকে কোনওদিন স্বস্তি পেতে দেবে না। নিষ্ঠুরের মতো শোষণ করে যাবে তাকে হয়তো আমৃত্যু। এদিকে দেবদ্যুতির সঙ্গেও একই ছাদের নীচে দিনের পর দিন বসবাস করার পরিণতিই বা কী? কিছুই বুঝতে পারত না তাপসী। শুধু দুশ্চিন্তা এবং অস্থিরতায় কষ্ট পেত। মাঝে মাঝে আত্মহননের কথাও ভাবত। কিন্তু সাহস পেত না। নিজের হাতে নিজের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো সাহস তাপসীর ছিল না। অশ্বিনীর সঙ্গে হেমন্তবাবুর যে গণ্ডগোল চলছে এটা তাপসী বেশ বুঝত। টাকার চাহিদা অশ্বিনীর শুধুই বাড়ছিল। একদিন তাপসীর মনে হল, দেবদ্যুতিকে তার অতীতজীবনের কথা সব বলবে। তারপর দেবদ্যুতির সঙ্গেই পরামর্শ করবে কীভাবে অশ্বিনীর ব্ল্যাকমেলিং থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

চোদ্দ

একদিন রাতে বিছানায় দেবদ্যুতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে শুয়ে থাকার সময় তাপসী নিজের অতীত-জীবনের সব খুলে বলবে ভেবেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারল কি?.....

সেদিন বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসেছিল দেবদ্যুতি। আজকাল প্রায়ই খায়। প্রসূনের পাল্লায় পড়ে। মিতুল নামের সেই কবিযশোপ্রার্থিনীকে নাকি বিয়ে করতে চলেছে প্রসূন। তার যে ডিভোর্সের মামলা চলছিল তা পরিণতির মুখে। সামনের সপ্তাহে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেবেন। প্রসূন এবং তার স্ত্রী দুজনেই ডিভোর্স চেয়েছে। মিউচিউয়াল ডিভোর্স। ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে রায় দেওয়া অনেক সহজ হয় গেছে। ডিভোর্স পেলেই মিতুলকে বিয়ে করবে প্রসূন। তারপর তার প্রকাশনার ব্যবসা শুরু করবে। প্রথমে প্রকাশিত হবে মিতুলের একটা কবিতার বই। প্রসূনের ধারণা মিতুল খুব ভালো কবিতা লেখে। দেবদ্যুতি এসব নিয়ে কোনও বিতর্কে যায়নি আর। শুধু মিতুলের কবিতা পেলে প্রয়োজনমতো এডিট করে 'বেলা অবেলা'য় ছেপে দিয়েছে।

সেদিন দরজা খুলেই তাপসী বুঝেছিল, দেবদ্যুতি মদ্যপান করেছে। মুখে কিছু না বলে দেবদ্যুতির হাত থেকে তার অ্যাটাচিটা নিয়ে তাপসী চলে যাচ্ছিল। দেবদ্যুতি ডাকল—শোনো তপু তোমার কানে কানে একটা কথা বলি?—কী কথা আবার? তাপসীর ভুরু কুঁচকে এগিয়ে এল।—কী এমন কথা কানে কানে বলতে হবে?—এই যে এই কথাটা—বলে দেবদ্যুতি তাপসীকে নিজের দিকে টেনে নিল। তারপর হতচকিত তাপসীকে চুমু খেল। গভীর এবং উষ্ণ এক চুমু। তাপসী প্রস্তুত ছিল না। তার নাকে ভেসে এল মদের মিহি-উগ্র গন্ধ।—একী? বাড়িতে ঢুকেই এসব কী ঢং শুরু করলে?—এই বলে তাপসী ছিটকে সরে আসতে চাইল দেবদ্যুতির আলিঙ্গন থেকে। কিন্তু পারল কোথায়? দেবদ্যুতি তাপসীর ঠোঁট কামড়ে দিল দাঁত দিয়ে। তারপর জিভ দিয়ে স্পর্শ করছিল তার গলা, ঘাড়। তারপর আরও নীচে বিভাজিকার সূচনাবিন্দুতে দেবদ্যুতির নাছোড় এবং আতপ্ত জিভ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। তাপসীর ম্যাক্সির নীচের অংশ টান মেরে তুলে দিয়ে দেবদ্যুতি হাত দিয়ে স্পর্শ করল তাপসীর অপরূপ খিলান-সদৃশ উরুদ্বয়, আঙুল দিতে চাইল তাপসীর যোনিমূলে আঁট হয়ে চেপে থাকা প্যান্টিতে।

—একী করছ! ছাড়ো ছাড়ো! বাড়িতে ঢুকেই একী পাগলামি?......তুমি আজকে অ্যাবনরম্যাল বিহেভ করছ। পেটে মদ পড়লেই তুমি এরকম করো।

—প্লিজ তাপসী! এভাবে বোলো না। আজ খুব...ইচ্ছে করছে। গত চার-পাঁচদিন তো কিছু করতেই পারিনি। তোমার পিরিয়ড চলছিল।

—সব বুঝলাম। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কেন? এই ফাঁকা ফ্ল্যাটে আমরা দুজন ছাড়া আর কে আছে? তাহলে ধীরে সুস্থে হোক। বাইরের জামা-প্যান্ট ছাড়ো। খেয়ে নাও। আজ স্পেশ্যাল আইটেম কী বলতো?

—কী?

—শুধুমাত্র পনির আর টমাটো সস দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। এই সংখ্যার সানন্দাতে রান্নাটা লেখা আছে। তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো। আমি খাবার সাজাই টেবিলে। এখন আর দুষ্টুমি নয়।

খাওয়া-পর্ব শেষ হলে তাপসী ডাইনিং টেবিল থেকে বাসনগুলো গুছিয়ে তুলে সিঙ্ক-এ রাখছিল। এরপর সে চানঘরে যাবে। গা ধোবে। হালকা-ফিনফিনে নাইটি পরবে। আজ কোন রং? ভায়োলেট? হ্যাঁ ভায়োলেট। ঐ রং দেবদ্যুতির বড় পছন্দ। ওডিকোলন-মিশ্রিত জলে শরীর ধুয়ে খুব ঝরঝরে লাগবে নিজেকে। তারপর পাউডার। তারপর পারফিউম। তারপর শুরু হবে রাতের বিছানায় দেবদ্যুতির দস্যিপনা।

যেন আসন্ন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে দেবদ্যুতিও। তাপসী যতক্ষণ চানঘরে, দেবদ্যুতি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আর আলমারি খুলে লকারের গোপন থেকে বের করেছে সেই মহার্ঘ বস্তুগুলি। নাহ্ কোন অলঙ্কার নয়। কিংবা নোটের বান্ডিল নয়। এগুলো হল বই। ইংরেজি ম্যাগাজিন। সদর স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এবং এস. এন. ব্যানার্জি রোডের ফুটপাতের চতুর হকারদের কাছ থেকে যে পত্রিকাগুলো সে একটা একটা করে কিনে আসছে বহুদিন। কাউকে বলা হয়নি কোনওদিন, বলা যাবেও না হয়তো, তাপসীকে তো নয়ই; ইদানিং তার তাপসীর শরীরটাকে কীরকম পুরনো এবং একঘেয়ে মনে হয়। ঐ মেয়েটার সব কিছু সে জানে। তার স্তনের গড়ন জানে, যোনির গড়ন ও গভীরতা জানে; তাপসীর বাহুসন্ধিতে পিঙ্গল ঘাসের মতো রোমগুলির জ্যামিতি জানে, তাপসীর পশ্চাৎদেশের দুই মাংসল মালভূমি এবং কালো, দগদগে এক বিছের মতো বিভাজন রেখাটি জানে। দেবদ্যুতি জানে স্তনদ্বয় মুচড়ে ধরলে কিংবা কালো আঙুরের মতো স্তনবৃন্তে জিভ দিলে তাপসী কীভাবে শিউরে ওঠে। আর সঙ্গমমুহূর্তে তাপসী শুয়ে থাকতে চায় না। সে উঠে বসতে চায় দেবদ্যুতির জানুদ্বয় ও তলপেটের ওপর। তারপর দেবুদ্যুতির রক্তবর্ণ শহীদ-মিনারকে সে দুই হাতে ধরে বার বার পরখ করে দেখে নিতে চায়। নিজের পিচ্ছিল সুড়ঙ্গে প্রবেশের জন্যে সে কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

এসব বড় পুরনো খেলা। পৌনপুনিকতায় আক্রান্ত। তাই বিদেশি পত্রিকার সিল্ক-মসৃণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় নগ্নতার যে বিপুল, বর্ণিল এবং বিচিত্র সমারোহ তা বারবার দেখে যেন সে নিজেকে শয্যা-যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে থাকে। পত্রিকাগুলির বীভৎস সব ছবিগুলো তার গোপন অনুপ্রেরণা। আজকাল মাঝে মাঝে দেবদ্যুতির মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি তাপসী এবং তার শরীর যদি ক্লান্তিকর এবং

পুরনো হয়ে যায় তাহলে সারাজীবন সে বইবে কীভাবে তাকে? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পায় না দেবদ্যুতি। তার উত্তর পায় না বলেই সে তখন আত্ম-প্রতারণায় দক্ষ একজন চিন্তক কিংবা দার্শনিকের মতো নিজেকে বার বার আশ্বস্ত করে। সে মন্ত্রের মতো আউড়াতে থাকে এই কথাগুলো—আরে শরীরটাই কি সব? শরীরের মোহ কতদিন থাকে? জীবন আরও অনেক বড়ো। ভালোবাসা অনেক মহান। সে মানুষকে ভিখিরি করে। একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো তাপসীকে। দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে ঝরে পড়ছে পাথর....

সেদিন বিছানায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ঘরে জ্বলছিল হালকা নীল আলো। দুধের ফেনার মতো বিছানায় দুটো নগ্ন শরীর প্রবল হিংস্রতায় বারবার ঘাঁটছিল একে ওকে। চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে দেবদ্যুতি তার তলপেটের ওপর তাপসীকে উঠে আসতে বলল। তাপসী হঠাৎ বেঁকে বসল। নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নাইটি দিয়ে নিজের টাঁড়-নগ্নতা ঢেকে দিল।

—কী হল?—আর্তস্বর দেবদ্যুতির।

—আজ মুড নেই।

—কেন? আমি তো অবাধ্য হইনি? কনডোম পরে নিয়েছি....?

—ওসব নয়। আমি জানতে চাই....

—কী?

—আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা কবে হবে? তুমি যে বললে ম্যারেজ-রেজিস্টারের অফিসে নোটিশ দেবে?

—দেব তো। দরকার হলে আগামীকালই দেব।....তুমি কি আমার বিশ্বস্ততাকে সন্দেহ করো?

—ঠিক তা নয়। তবে.....আজকাল কীরকম ভয় করে....মনে হয় তুমি যদি আমাকে তাড়িয়ে দাও?

—ওহ বুলশীট! আমি তোমাকে ভালোবাসি। কেন ভালোবাসি জানো?

—কেন?—তাপসী উদ্গ্রীব।

—কারণ তুমি ভীষণ পবিত্র এবং ভালো। আই এসটিম ইওর সেকরেডনেস। আমার স্ত্রী হবার যাবতীয় যোগ্যতা তোমার আছে। এসো....আমি আর পারছি না।

তাপসীর একবার মনে হয়, তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু নিজের যোগ্যতা নিয়ে দেবদ্যুতি নিশ্চয়ই ভাবে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাকে সেভাবে ভাবতে শেখায়নি। অশ্বিনী যতই নিষ্ঠুর, প্রতারক এবং ঠগবাজ হোক; মেয়েদের সঙ্গে বিছানার যুদ্ধে সে কিন্তু দেবদ্যুতির থেকেও অধিকতর যোগ্য সৈনিক। অশ্বিনীর সঙ্গে প্রতিটি ভুল যুদ্ধের শেষে তার তৃপ্তি হত অনেক বেশি। এ মেয়েদের, একমাত্র মেয়েদেরই একান্ত এবং গোপন অনুভব। এসব কথা কাউকে বলা যায় না। কেবল নির্জন ঘরের মূক দেওয়ালগুলোকে বলা যায়। গভীর এক দীর্ঘনিশ্বাস

ছেড়ে নগ্ন তাপসী দেবদ্যুতির তলপেটের ওপর ধীরে ধীরে উঠে আসে।

গতানুগতিকায় আক্রান্ত ধূসর জীবন একঘেয়েমির ক্লান্তিকর ছন্দে বহে যায় আজকাল। তাপসীর সব কীরকম বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। সেবাদাসীর আনুগত্য নিয়ে সে এ বাড়িতে রয়ে গেছে। ম্যারেজ-রেজিস্টারের অফিসে নোটিশ দিতে সে বোধহয় কাজের চাপে ভুলে গেছে। তাপসীর মাঝে মাঝে মনে হয় সে যদি এ বাড়ি থেকে চলে যায় কেমন হয়? যদি দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে ঘরবাড়ি খুঁজে নেয়। সে তো একজন সেবাদাসী কিংবা রক্ষিতা ছাড়া কেউ নয়। অশ্বিনী তাকে নষ্ট করেছে। এ বাড়িতে একজন পুরুষের রক্ষিতা হয়ে সে আছে। একজন পুরুষের রক্ষিতা এবং অনেক পুরুষের রক্ষিতা হওয়ার মধ্যে তফাতটা ঠিক কী?.....

একদিন দুপুরে, অসময়ে, ডোর-বেল বেজে উঠে। কে আবার এল? টিভি দেখতে দেখতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। ডোর-বেলের শব্দে সচকিত হয়ে সে উঠে এল। নিশ্চয়ই কোনও সেলস্‌গার্ল। দুপুরে তো এরাই আসে। আই-হোলে চোখ রেখে তাপসী দেখল অন্য কেউ নয়,—অশ্বিনী। খুলবে কি খুলবে না? উপায়ই বা কী দরজা না খুলে? দুপুরের নির্জনতাকে তছনছ করে অশ্বিনী বিরামহীনভাবে ডোর বেল বাজিয়ে যাচ্ছে। দরজা খুলল তাপসী। প্রায় হুড়মুড় করে অশ্বিনী ভেতরে এল। দরজা বন্ধ করল তাপসী। সেই ঘিয়ে-ভাজা কাবলি জুতো খুলে অশ্বিনী সামনের ঘরে ঢুকল। বসল চেয়ারে। তাপসীকে বলল ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিতে। তাপসী তাই করল। মুখে একটা কথাও এখনও বলেনি সে। শুধু অশ্বিনীকে লক্ষ করে যাচ্ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে তার কী মতলব। এই তো দিন দশ আগে এসেছিল অশ্বিনী। দু-হাজার টাকা নিয়ে গেছে। যে টাকাটা কোনও এক অদৃশ্য নিয়মে অশ্বিনীর মাসোহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—একটু জল দাও তো। গলাটা শুকোচ্ছে।....তারপর এক কাপ চা।... তোমার সঙ্গে কথা আছে। নির্বাক তাপসী জল দেয়। চা তৈরি করতে করতে ভাবে কী কথা বলবে অশ্বিনী। আবার কোন্ কথা। লোকটাকে বড় ভয় হয় তার। আবার কোন্ চক্করে ফেলবে কে জানে? আপাদমস্তক দু-নম্বরি একজন মানুষ অশ্বিনী। তার পাল্লায় পড়ে তাপসীর জীবনটাই এলোমেলো হয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অশ্বিনী অবশ্য আজ আর ভনিতা করল না। বলল—খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।....খুব বিপদ?

—কীসের বিপদ?

—হেমন্তর সঙ্গে একেবারে বনছিল না।...ওর দোকানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ?.....কেন?—অশ্বিনীর বন্ধু হেমন্তবাবুর কথা উঠলেই তাপসীর কীরকম অস্বস্তি হয়। ঐ লোকটার কথা ভাবলেই কীরকম ঘেন্না হয়। জঘন্য লোক। টাকা আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু বোধহয় বোঝে না। টাকা দিয়ে সব মেয়েকেই

নিজের কেনা বাঁদি করে ফেলা যাবে এরকম ধারণা লোকটার। তবুও এই মুহূর্তে অশ্বিনীর কথা শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। হেমন্তবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মানে কি অশ্বিনী এখন বেকার? তাহ'লে তার চলছে কী ভাবে?

—হেমন্তর গোলামি ছেড়েছি কি সাধে? বাঞ্চোৎ আমার নামে কী অভিযোগ এনেছিল জানো?—চা শেষ। পকেট থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করল অশ্বিনী। একটা বিড়ি বেছে নিয়ে সেটার উলটোদিকে ফুঁ দিল। তারপর ধরল। বিড়ির কড়া গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না তাপসী। সে নাকে রুমাল চাপা দিল। অশ্বিনীর এখন কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বিড়িতে মাঝে মাঝে টান দিয়ে নিজের কথা বলতে ব্যস্ত।

—একদিন শালা আমাকে বলে কিনা ওর দোকান থেকে মালপত্র সরিয়েছি। কয়েকটা ভেপার ল্যাম্প, মিক্সি আর ভিসিপির হিসেব নাকি মিলছে না। বোঝো কান্ড! আরে দোকানে কি আমি একা থাকি? রাতে আমিই দোকানে শুয়ে থাকি এটা ঠিক। কিন্তু সারাদিন কি আমি দোকানে বসে থাকি? কত রকম ধান্দায় এদিক-ওদিক যেতে হয়। হেমন্তর কাজেও তো বাইরে ঘুরতে হয় আমাকে। তখন দোকানে কে থাকে? রাজেশ থাকে। সে ছোকরা মহা ওস্তাদ। ড্রাগের নেশা করে। তো সুযোগ বুঝে সেও তো মালপত্র টুকটাক সরাতে পারে। নাকি বলো? কাঁচা পয়সা তো ওরও দরকার? আমার থেকে বেশি দরকার হয়তো। তো তুই তাকে কিছু বলবি না আমাকে দোষারোপ করবি?...তুমি বলো তাপসী? এটা কি ঠিক করল ও? এতদিনের সম্পর্ক আমাদের। ওর বিপদের সময়, মানে বিজনেস যখন দাঁড়ায়নি তেমন, খুব চেষ্টা করছে হেমন্ত, তখন তো আমি ওর কতো বড় বড় অর্ডার ধরে এনেছি! সে সব ভুলে গিয়ে আমাকে চোর অপবাদ দিয়ে দিল? দোকান থেকে জিনিসপত্তর ফুটে যাওয়ার জন্যে ও যখন আমাকেই দায়ী করল, তখন আমার মাথাটাও কীরকম গরম হয়ে গেল। এক কথায় ছেড়ে দিলুম ওর চাকরিটা.....।

—তার মানে এখন কিছু করছ না? রাত কাটাচ্ছো কোথায়? হেমন্তবাবুর দোকানই তো তোমার শোবার জায়গা ছিল?

—আছি ঘরভাড়া নিয়ে।...থাকার অযোগ্য। তবুও থাকতে হচ্ছে। তুমি তো আর থাকতে দেবে না!.....দেবে? দেববাবুর ভালো লাগবে ব্যাপারটা? একই মেয়েমানুষের দুজন নাগর?

—বাজে কথা একেবারে বলবে না। যদি ওরকম কথা বলো তাহলে এখনই দূর হয়ে যাও!—তাপসী জোরে চেঁচিয়ে উঠল। এত জোরে যে অশ্বিনী চমকে তার মুখের দিকে তাকাল।

—এত রেগে যাচ্ছো কেন? একটু ইয়ার্কি করাও যাবে না?

—নাহ যাবে না।...দেববাবুকে নিয়ে কোনও ইয়ার্কি নয়। তুমি তার নখের যুগ্যি নও।

—সে তো জানি। দেববাবুর রেস্ত আছে। তোমাকে পুষচে তাই সে ভালো। দেবতা। আমার রেস্ত নেই তাই আমি শালা হারামিরও হারামি।

—দেবুবাবু পুষচে এরকম জঘন্য কথা আর বলবে না। তাহলে জিভ জিঁড়ে দেব। আমি কারোর পোষ্য নই। নষ্ট তো তুমি আমাকে করেছ! তারপর থেকে শরীর নিয়ে আমার বাছবিচার নেই। তবে এ বাড়িতে থাকা না থাকা সবটাই আমার মনের ইচ্ছে। যখন ইচ্ছে হবে আমি এ বাড়ি ছেড়েও চলে যাব।—তাপসীর গলা কান্নায় বুজে এল।

—আরে এত রাগারাগি করছ কেন? যা হয়েছে হয়েছে। পুরনো কথা খুঁটে আর কী লাভ? তুমি দেববাবুর সঙ্গে আছো থাকো না। আমি কি তোমার বাড়া ভাতে ছাই দিতে এসেচি? আমি আসলে এসেছি একটা দরকারে। সময়টা খারাপ চলচে। দরকাটা শুনবে না?

—কী দরকার?

—আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে। একটা বিজনেস শুরু করব। নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা তো করতে হবে? এখন আছি বেলেঘাটার দিকে একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে। তাও দুশো টাকা মাসের ভাড়া। তারপর খাওয়া খরচ। রেগুলার ইনকাম না থাকলে কোথা থেকে পাব টাকা।

—এখন কোথা থেকে পাচ্ছো?

—ঐ জমানো টাকা কিছু ছিল। তাই দিয়ে চলছে। তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারো? প্লাস্টিক গুডসের ব্যবসা করব ভাবছি। বাগড়ি মার্কেটে একজন দালালের সঙ্গে কথা চলছে। তবে প্রথমে তো কিছু ইনভেস্ট করতে হবে। হাজার পঁচিশেক টাকা হবে?

—পঁচিশ হাজার? এত টাকা কোথায় পাব?—তাপসী চমকে ওঠে।

—টাকাটা একটু বেশিই। তোমার কাছে নাও থাকতে পারে। তাহলে একটা বুদ্ধি দেব?

—কী?

—দেবুবাবুর থেকে টাকাটা ধার করো। উনি ব্যাঙ্কের অফিসার। ওঁর অনেক টাকা। পঁচিশ হাজার টাকা ওঁর কাছে নস্যি.....।

—দেববাবুর থেকে টাকা ধার করব? কী কারণ দেখিয়ে?

—কারণ?....কতরকম হতে পারে। তোমার মায়ের অসুখ। তোমার বোনের বিয়ে...।

—তুমি কী ভেবেছ বলো তো? চিরকাল আমাকে এভাবে ব্ল্যাকমেল করে যাবে? ...ব্ল্যাকমেল নয়তো কি? শুধু একটা ভয় দেখিয়ে তুমি প্রতি মাসে নিয়ম করে আমার কাছ থেকে টাকা খিঁচচ। এতদিন যাহোক পাঁচশ হাজার টাকায় চলছিল, এখন তোমার খাঁই বেড়ে গেছে। অন্য মতলব। সব মিথ্যে কথা তোমার। মিথ্যে

বলে আমাকে ঠকিয়েছ। আমাকে নষ্ট করেছ। বিয়ের ভান করে হেমন্তবাবুর রক্ষিতা করতে চেয়েছিলে আমাকে। শয়তান জানোয়ার কাঁহিকা! তোমাকে আর আমি ভয় পাই না। বেরোও তুমি এই বাড়ি থেকে!—তাপসীর দু-চোখে আগুন জ্বলছিল। তার বার বার মনে হচ্ছিল, এই লোকটা—এই জানোয়ারটার জন্যেই আজ তার এরকম অবস্থা। সে নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়িতে ফিরতে পারবে না কোনওদিন। দেবদ্যুতির দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা মর্জির ওপর নির্ভর করে তাকে কাটাতে হবে সারাজীবন। নাহ্, যা হয় হোক। যা বিপদ আসে আসুক। আর কোনওরকম আপোষ করবে না অশ্বিনীর সঙ্গে। অশ্বিনীর বায়না, টাকার লোভ মেটাতে মেটাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে তার। আর তাছাড়া। তাছাড়া—সত্যিই পঁচিশ হাজার টাকা সে এখনই পাবে কোথায়? আজ পঁচিশ হাজার চাইছে। আগামীকাল যে পঞ্চাশ হাজার চাইবে না তা কে বলতে পারে?....নাহ আর ভয় করছে না সে। এই আপদকে সে এখনই তাড়াবে বাড়ি থেকে....।

—ফোটো....এখনই ফুটতে হবে তোমাকে। আর কোনও প্রশ্রয় দেব না তোমাকে। আমার যা হয় হোক। তাপসী চেঁচিয়ে বলল।

অশ্বিনী কঠিন মুখে তাকিয়ে ছিল তাপসীর দিকে। তার হনু-উঁচু, শীর্ণ মুখে তেমন কোনও ভাবান্তর বোঝা যাচ্ছে না। তবে চোখের দৃষ্টিতে নানারকম আবেগ খেলা করছে। প্রথমে অবিশ্বাসের ছায়া ভেসে এল তার চোখে। তাপসী এভাবে ফুঁসে উঠতে পারে সে যেন ভাবতেই পারছিল না। তারপর বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তার চোখে। সবশেষে ক্রোধ। তীব্র ক্রোধ। অশ্বিনী সত্যিই এখন অসুবিধার মধ্যে আছে। হেমন্তর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। এখন সে আয়-হীন। ডুবতে বসেছে। খড়কুটো ধরে ভেসে থাকতে চাইছে। অসময়ে তাকে কে টাকা ধার দেবে? পরিচিত কারোর কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সুতরাং সে ভেবেছিল তাপসীকে বলে যদি.....

—তাহলে এই তোমার শেষ কথা? তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—হ্যাঁ। তাড়িয়ে দিচ্ছি। আর কখনো আমার কাছে আসবে না তুমি। আমাকে বিরক্ত করবে না।

—খুব বাড়াবাড়ি করছ তাপসী। এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।

—কী করবে তুমি আমার? কোন্ যমের বাড়ি পাঠাবে শুনি?

—এ বাড়ি থেকে দেববাবু তোমাকে দূর করে দেবে....!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। যখন সে জানবে তোমার আসল পরিচয়। তুমি যে ম্যারেড সেটা নিশ্চয়ই দেববাবু জানে না। জানে না—আমি আছি তোমার হাজবান্ড.....

—ঐ কথাটা তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না। তোমার মতো এরকম জানোয়ারকে আমি আর ভয় করি না। তুমি দেববাবুকে সব বলতে পারো। আমার কোনও ভয় নেই। দেববাবু অন্য মানুষ। তিনি ভালোবাসতে জানেন। তিনি আমাকে

ভালোবাসেন। তুমি সব বলতে পারো ওঁকে। উনি শিক্ষিত মানুষ। তোমার মতন মুখ্যু ঠগবাজ নন। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানলে উনি পাত্তাই দেবেন না। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। এখন হেমন্তবাবুকেও তুমি সাক্ষী মানতে পারবে না।

—তাহলে এই তোমার শেষ কথা?

—এই আমার শেষ কথা।

—এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে তাপসী!....

—হোক। আমি আর কোনও কিছুকেই ভয় করি না।

ঝড়ের রাতে ঝল্‌সে ওঠা বিদ্যুতের মতো দৃষ্টি হেনে অশ্বিনী বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল তাপসী। প্রথমে গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে কাঁদতে তার মনে হল, দেবদ্যুতি তাকে ভালোবাসে। তাকে সে চিনতে ভুল করেনি। অশ্বিনীর থেকে সব কিছু জানলেও দেবদ্যুতি কি তাকে এই আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেবে?....কখনোই না। বড় জোর সে তাপসীকে জিজ্ঞেস করবে অশ্বিনীর কথার সত্যতা কতটুকু। তখন কিছু গোপন করবে না তাপসী। সব কথা খুলে বলবে দেবদ্যুতিকে। বলবে কীভাবে অশ্বিনী তাকে ঠকিয়েছে। নিজের জীবনের কলঙ্কের কথা সে বলতে পারেনি এ বাড়িতে কাজে ঢোকার সময়। কোনও মেয়ে পারে? সব কথা বলার পর তাপসী দেবদ্যুতির পা-দুটো জড়িয়ে ধরবে। তোমার সেবাদাসী হয়েই থাকব সারাজীবন। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি যে বলেছিলে আমাকে ভালোবাসো। আমার শরীরকে শুধু নয়, আমাকেও তুমি ভালোবাসো। ঠিক আছে তুমি যা চাও তাই হবে। বিয়ের কথা আমি ভুলেও উচ্চারণ করব না। তুমি যেমন চাও সেরকমই লিভ টুগেদার করব আমরা। সারা জীবন তোমার সেবা করে যাবো ...।

পনেরো

সেদিন বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরল দেবদ্যুতি। দরজা খুলেই তাপসী বুঝল মদে চুর হয়ে আছে। অন্যদিন অবশ্য মদ্যপান করে বাড়ি ঢুকলে দেবদুতি বেশ মেজাজেই থাকে। হয়তো পায়ের জুতোজোড়া খুলেই সোজা চলে যাবে নিজের শোবার ঘরে। বাইরের জামাকাপড় পরেই চিৎ হয়ে পড়বে বিছানায়। তাপসীকে চেঁচিয়ে ডাকবে। তাপসী ঘরে এলে তাকে বলবে পাখার রেগুলেটর ঘুরিয়ে জোর করে দিতে। তারপর তাপসী ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করলেই ঈষৎ উষ্মার স্বরে বলবে—কোথায় যাচ্ছো? কাছে এসো। তাপসী এসব মুহূর্তে ব্যস্ততার ভান করে। জানায় যে তার এখনও অনেক কাজ বাকি। কিচেনে গিয়ে খাবারের জোগাড় করতে হবে। তাতে দেবদ্যুতি তুড়ি মারার ভঙ্গিতে বলে—আরে রাখো তো তোমার খাবার! আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি। আর কিছু খাবো না। অবশ্য তোমার খাওয়া বাকি। ...আচ্ছা ঠিক আছে খাবে এখন। আমার চুলে একটু বিলি কেটে দাও।

তাপসী আর গাঁইগুঁই করে না। বস্তুত সে তো এরকম কাতরতাই আশা করে তার পুরুষের কাছ থেকে। সে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেবদ্যুতি তার হাত ধরে এক হেঁচকা টান দিলে তাপসী হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার বুকে। যদিও খানিক আগে দেবদ্যুতি তাকে চুলে বিলি কেটে দিতে বলেছিল, সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা সেরকম ঘটে না। নেশাগ্রস্ত দেবদ্যুতি বিস্রস্ত বসনের তাপসীর বুকে যেটুকু আঁচল লেগে থাকে তা সরিয়ে দেয়। তাপসীর ঢলোঢলো দুই স্তনে মুখ গুঁজে দেয়। ব্লাউজ কিংবা কামিজের গতানুগতিক বাধা একেবারেই মানতে চায় না। যদিও তাপসী হাসতে হাসতে বলে—অ্যাই কী হচ্চে? অসভ্যতা! দুষ্টু কোথাকার! একটু তর সয় না। বাইরে থেকে এলে ফ্রেশ হও। তারপর না হয় ...। দুর্দমনীয় সংরাগে হাবুডুবু খেতে থাকা দেবদ্যুতি কোনও কথাই কানে নেয় না। তার তর সত্যিই সয় না। সে কামিজ থাকলে তা খুলে নিতে ইঙ্গিত করে। ব্লাউজ থাকলে পট্‌পট্‌ করে বোতামগুলো নিজেই খুলে দেয়। এরকম প্রবল আবেগের মুহূর্তে অবশ্য দেবদ্যুতি ব্রা খুলতে সবসময়েই ভুল করে। ঠিকঠাক হুকে আঙুলের চাপ দেবার বদলে আজেবাজে টানা-হ্যাঁচড়া করে। অধৈর্য হয়ে ওঠে ক্রমশ। তখন তাপসী—দুষ্টুটা কিচ্ছু পারে না—এই বলে নিজেই ব্রা-এর হুক খুলে নিরাবরণ হয়। আর অবধারিতভাবে দেবদ্যুতি তাপসীর কালো আঙুরসম স্তনবৃন্ত নিজের ধারাল দাঁতে চেপে ধরবেই। আর তাপসী যন্ত্রণায় বলে উঠবে—উঃ .... অ্যাই কী করচ? লাগে

না ...? আর এ কথা শুনেই যেন দেবদ্যুতি আরও কামার্ত হয়ে ওঠে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুজনে হাঙরের লুটোপুটি খায়।

কিন্তু আজ যদিও দেবদ্যুতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করছে তবুও সে তো অন্যদিনের মতো ব্যবহার করল না! হাসিমুখে ডাকল না তাপসীকে! বরং আজ দেবদ্যুতি যেন বড় বেশি গম্ভীর। কেন? কী হয়েছে তার? তাপসীর চোখ নিঃশব্দে অনুসরণ করছিল দেবদ্যুতিকে। আজ দেবদ্যুতি বিছানায় শুল না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সশব্দে। এরকম দিনে পেট ভরা থাকে দেবদ্যুতির। সে রাতে ডিনার প্রত্যাখান করে। আজও কি তাই করবে? তাহলে তাপসী কি শুধু নিজের জন্যেই খাবার গরম করবে? কিছুই বুঝতে পারছে না সে। দেবদ্যুতির ব্যবহার সত্যিই কীরকম খাপছাড়া লাগছে। তাপসী অনিশ্চিতভাবে আলোকিত কিচেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুক ঢিপঢিপ করছিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আজ সে স্বীকারোক্তি করবে দেবদ্যুতির কাছে। যত কঠিনই মনে হোক, স্বীকারোক্তি তাকে করতেই হবে। তার অতীতজীবনের কথা সে সব বলতে চায় দেবদ্যুতিকে। শয়তান অশ্বিনীর কথা বলবে। আর তারপর ক্ষমা চাইবে দেবদ্যুতির কাছে। তার পায়েও ধরবে প্রয়োজন হলে। তাপসীর ধারণা দেবদ্যুতি তাকে ঠিক ক্ষমা করবে। কত লেখাপড়া জানা মানুষ দেবদ্যুতি। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকে। শুধু পড়া নয়। লেখালেখিও করে দেবদ্যুতি। তাপসী জানে, যারা দিনরাত লেখাপড়ার মধ্যে থাকে তারা খুব উঁচুমনের মানুষ হয়। ক্ষুদ্রতা তাদের আক্রমণ করতে পারে না। দেবদ্যুতিকে মনে মনে এভাবেই শ্রদ্ধা করে তাপসী।

একসময় দরজা খুলে গেল। তাপসী দেখল দেবদ্যুতির পরনে পাজামা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি। চোখ লালচে ভাব। কিন্তু টলায়মান ভাবটা কেটে গেছে।

—কিছু খাবে না? —তাপসী জিজ্ঞেস করল।

—নাহ। তুমি খেয়ে নাও। —দেবদ্যুতির হাতে সিগারেট জ্বলছে। সে ডাইনিং স্পেসের দিকে এল। তাপসী বলল—তুমি শোবে? তোমার চুলে বিলি কেটে দেব?

—কিছু করতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও। ... শালা মেজাজটাই বিগড়ে আছে। —কথাটা বলে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিল দেবদুতি।

—কেন? কী হল? ...অফিসে গণ্ডগোল?

—নাহ। ... অফিস ঠিক আছে। ... প্রসূনের সঙ্গে বনচে না। তাপসী প্রসূনের নামই শুধু শুনেছে। তাকে চোখে দেখেনি। সে চুপ করে রইল।

—খুব বাড়াবাড়ি করছে প্রসূন। ... এক মহিলার পাল্লায় পড়েছে। তাকে নাকি বিয়ে করবে। খুব খাচ্ছে মেয়েটাকে। বিয়ের লোভ দেখিয়ে। সে শালীও সেয়ানা। ডিভোর্সি। প্রসূনও ধোয়া তুলসিপাতা নয়। বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন দুজন সেয়ানে সেয়ানে জমেছে ভালো ...।

—তোমার সঙ্গে কী নিয়ে গণ্ডগোল?

—মেয়েটা কবিতা লিখতে পারে না। এখনকার কবিতার ল্যাংগুয়েজ কেমন হয় কোনও কনসেপ্টই নেই। তার ছাইভস্ম পদ্যগুলো আমাকে ছাপতে হবে। এডিট করে আগে ছেপেওছি কয়েকটা। আজ প্রসূন কী বলে জানো?

—কী?—তাপসী এসব কথাবার্তায় কোনও আগ্রহই পাচ্ছিল না। তবুও নেহাত কথা চালাবার বাসনায় তাকে বলতে হয়।

—প্রসূন আজ বলে কিনা মিতুলের কবিতা নিয়ে বেলা অবেলায় একটা ক্রোড়পত্র করতে হবে।

—মিতুল বুঝি মেয়েটার নাম?

—হ্যাঁ ...। বুঝে দেখো একবার কথাটা! যে লিখতেই জানে না তাকে নিয়ে ক্রোড়পত্র? প্রসূনের মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। বলে কিনা ক্রোড়পত্রে থাকবে মিতুলের গুচ্ছ কবিতা, সে নাকি একটা উপন্যাস লিখেছে সেটা আর মিতুলের ইনটারভিউ। সেই ইনটারভিউ নেবে কে জানো? .... প্রসূন নিজে। শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। আমি বললাম, বেলা অবেলা পত্রিকা আর সম্পাদনা করতে পারব না আমি। প্রসূন আমাকে সাফ জানিয়ে দিল যে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সে নাকি নতুন সম্পাদক ঠিক করে ফেলেছে। বুঝে দেখো একবার? একটা ঢলানী মাগীর পাল্লায় পড়ে প্রসূন আমাকে এভাবে অপমান করল? আমাদের ফ্রেন্ডশিপ-এর কথাটা মনে এল না। আমি যে বেলা অবেলাকে ভালোবাসি, নিজের অনেক সময় ব্যয় করি পত্রিকাটা দাঁড় করাবার জন্যে সে কথা একবারও মনে হল না প্রসূনের? এতবড় বেইমান সে? এরকম স্কাউন্ড্রেল?—দুই হাতে মাথা ডুবিয়ে বসে রইল দেবদ্যুতি। রাত ক্রমশ বাড়ছিল। তাপসীর খিদে চাগাড় দিচ্ছিল। একটা মশা ক্ষমাহীন অবাধ্যতায় কানের কাছে বিন্‌বিন্ করেই যাচ্ছিল। দেবদ্যুতি চুপচাপ বসে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় ঝাঁ করে উঠে পড়ল। চলে যাচ্ছিল শোবার ঘরের দিকে।

তাপসী বলল—তাহলে কিছু খাবে না?

—নাহ্। ইউ টেক ইওর ফুড। আমি শুয়ে পড়ছি।

—তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

—কী কথা?

—জরুরী কিছু কথা।

—এখন ওসব শুনব না। ... জরুরি কথা? তোমার সঙ্গে কী জরুরি কথা থাকতে পারে আমার? আজ ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। পরে একসময় শোনা যাবে। —দেবদ্যুতি শোবার ঘরের দিকে এগোচ্ছে। তাপসী প্রাণপণে বলতে চাইল—এখুনি আমার কথা শুনতে হবে তোমায়। আমি খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি। প্রথম থেকেই ... এ বাড়িতে ঢোকার সময় থেকেই আমি একটা অপরাধ করে ফেলেচি। আমি আমার জীবনের সব কথা তোমাকে বলিনি। তোমার মাকেও বলিনি। আজ বলতে চাই।

আমি চাই তোমাকে সব খুলে বলতে। যাতে অশ্বিনী তোমাকে আমার সম্বন্ধে ভুল বোঝাতে না পারে। অশ্বিনী একটা মূর্তিমান শয়তান। ওর হাত থেকে আমি মুক্তি চাই। ... কিন্তু নিজের বুকের ভেতরে কথাগুলো কলরব করলেও তাপসী তা আদৌ বলতে পারল না দেবদ্যুতিকে। কারণ কিছু বলতে পারার আগেই দেবদ্যুতি নিজের ঘরে ঢুকে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। ...

ষোলো

পরের দিন দুপুর নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। তাপসী তখন শুয়েছিল। মাথাটা ধরেছে। গতরাতে ভালো ঘুম হয়নি। দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেছে। অনেক কথা বলার ছিল তার দেবদ্যুতিকে। নির্মল ও অকপট এক স্বীকারোক্তির জন্যে সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। ভুল হয়নি তাপসীর। দেবদ্যুতিকে সে ঠিকই চিনেছে। যে পুরুষের সঙ্গে দিনের পর দিন শোওয়া-বসা, এক ছাদের নীচে দিনের পর দিন বসবাস করা তাকে চিনতে ভুল হবে কেন? তাপসীর সব কথা শুনে দেবদ্যুতি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দেবে। খুব আধুনিক মনের মানুষ দেবদ্যুতি। কত পড়াশোনা তার। কত বিদ্যে। ভালোবাসবার ক্ষমতাও তার খুব। মাঝে মাঝে তাপসীর মনে হয় বটে যে দেবদ্যুতি বোধহয় তার শরীরটাকেই শুধু ভালোবাসে। পরে আবার অন্যরকমও মনে হয়েছে। শুধু শরীর কেন হবে? তাপসীর সবকিছুকেই দেবদ্যুতি ভালোবাসে। শুধু যা বিয়েটাই হয়নি। কিন্তু তারা থাকে তো পুরোপুরি স্বামী-স্ত্রীর মতোই। তাপসীর কোন শখটা মেটাতে বাকি রেখেছে দেবদ্যুতি? এই তো সেদিন একটা সুন্দর হিরের নেকলেস কিনে এনেছে সে তাপসীর জন্যে। নিজের হাতে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। তাপসীর মন আনন্দে উপচে পড়ছিল। তবুও সে বলেছিল—এত খরচ করার কোনও মানে হয়? দেবদ্যুতি বলেছিল—আমি যাকে ভালোবাসি তার জন্যে সব করতে পারি। আরো জুয়েলারি এনে দেব তোমাকে। জুয়েলারি দিয়ে মুড়ে রাখব আমার ভালোবাসার মেয়েকে।...সুতরাং তাপসীর মুখে তার অতীত জীবনের কথা শুনে দেবদ্যুতি নিশ্চয়ই বলবে—কালীঘাটের বিয়ে আবার বিয়ে নাকি? ছো! অশ্বিনী লোকটাকে আমি জেলে পাঠাব। আর তোমার সঙ্গে বিয়েটাও আমি সেরে নেব। এভাবে আর থাকা ঠিক নয় আমাদের। হাজার হোক সমাজ বলে একটা ব্যাপার—স্যাপার তো আছে?...কিন্তু কথাগুলো তো এখনও দেবদ্যুতিকে বলতেই পারল না তাপসী? তাড়াতাড়ি বলে ফেলার দরকার। শয়তান অশ্বিনীকে তার বিশ্বাস নেই। সে এখন চোট খাওয়া সাপ। যে কোনও মুহূর্তে ছোবল দিতে পারে।

টেলিফোনটা বিরক্তিকরভাবে বেজেই যাচ্ছে। তাপসী বিছানা থেকে উঠে ডাইনিং স্পেসে এল। ওখানেই থাকে টেলিফোন। রিসিভার তুলে স্বরে যথেষ্ট বিরক্তি মিশিয়ে বলল—হ্যালো?

—ডিসিশান চেঞ্জ করবে তো?—অশ্বিনীর ফ্যাঁসফেঁসে গলা।

—কী ডিসিশান?

—আচ্ছা ঠিক আছে। পঁচিশ হাজার না পারো কুড়ি দাও। টাকাটা আমি তোমাকে ফেরত দেব। একেবারে নয়। কিস্তিতে।...তবে সুদ দেব না। নিজের বউকে কেউ সুদ দেয়?—ফোনের মধ্যেই যেন হাসল অশ্বিনী।

—একটা পয়সাও আর তোমাকে দেব না আমি।...একটা পয়সাও না। তুমি অনেক শুষেচ আমাকে। ছিবড়ে করে দিয়েছ। আর আমি ভয় করি না তোমাকে। তুমি আমাকে অনেক ঠকিয়েচ। অনেক জ্বালিয়েচ।...

—তাপসী পাগলামি কোরো না।... আর একটু ভেবে দ্যাখো।...টাকাটা আমাকে ধার দাও তাপসী। আমি আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাই। প্লাস্টিক গুডসের মার্কেট এখন খুব ভালো। আমি দাঁড়িয়ে যাব। যদি তুমি আমাকে একটু হেল্প করো।

—একটা পয়সাও আমি তোমাকে দিতে পারব না।

—এই তোমার শেষ কথা? এর পরিণতি কিন্তু ভালো হবে না।

সক্রোধে তাপসী রিসিভার নামিয়ে রাখল। তার হাত কাঁপছিল। রগের কাছটা দপ্‌দপ্ করছিল। সে নিজেকে ছেড়ে দিল বিছানায়। আজ দেবদ্যুতি অফিস থেকে ফিরলেই সে সব কথা জানাবে। যাতে অশ্বিনী দেবদ্যুতির মাথা ঘুলিয়ে দিতে না পারে।

কিন্তু চোট খাওয়া সাপ সত্যিই সাংঘাতিক। যে কোনও মুহূর্তে সে ক্ষতি করতে পারে। ঢেলে দিতে পারে তীব্র গরল। তার প্রার্থিত শিকারকে সে কোনও সুযোগই দিতে চায় না।

আজও বেশ রাত করে দেবদ্যুতি বাড়ি ফিরল। তবে মদ খায়নি। যদিও ভীষণ গম্ভীর তার মুখ। একরাশ কালো মেঘ যেন জমে আছে দেবদ্যুতির মুখে। বাড়িতে ঢুকেই সে আক্রমণ করল তাপসীকে।

—অশ্বিনী কে?—কঠিন স্বর দেবদ্যুতির।

তাপসী চুপ করে ছিল।—কী হল? উত্তর দিচ্ছ না কেন? অশ্বিনী কে?...ঐ ফালতু নোংরা লোকটার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল? তুমি ম্যারেড? একজন ভোগ করেছে তোমাকে? আরও কতজন ভোগ করেছে কে জানে? তুমি তাহলে স্রেফ একটা বাজারের মেয়ে? একটা বাজারের মেয়েকে আমরা এ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম? ছিঃ ছিঃ ! তোমার মতো নোংরা মেয়ের সঙ্গে আমি দিনের পর দিন...ওহ হরিবল! তাপসী মূক দাঁড়িয়ে ছিল। নাহ, কাঁদেও-নি। কাঁদবে কেন? সে দেখছিল আসল দেবদ্যুতিকে।...হ্যাঁ এই তো আসল দেবদ্যুতি। মুখোশহীন। বর্মহীন। সংস্কারচ্ছন্ন। প্রাচীনমনস্ক। স্বার্থপর। ভিতু। তাপসীর ভুল হয়েছিল। এই দেবদ্যুতিকে সে চেনেনি। মুখোশের আড়ালে দেবদ্যুতির আসল মুখ সে আজ প্রথম দেখছে। তাহলে দেবদ্যুতি আলাদা কিছু নয় প্রায় অশ্বিনীর মতোই। সব পুরুষ কি আলাদা কিছু নয়। প্রায় অশ্বিনীর মতোই। সব পুরুষই কি এরকম? তাপসী ভাবছিল। কীভাবে আর নিশ্চিত হবে তাপসী? সে তো শুধু অশ্বিনীকে দেখেছে, চিনেছে। আর এখন চোখের সামনে

দেবদ্যুতিকে দেখছে, চিনছে।

—অশ্বিনী হাজরা নামের লোকটা যখন অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল আমি কিছুই বুঝিনি। একথা সেকথার পর একটা খামে ভরা চিঠি গুঁজে দিল আমার হাতে। কেটে পড়ল। যাচ্ছেতাই ভুল বাংলায় লেখা চিঠি। কিন্তু যা বলতে চেয়েছে বোঝা তো যায়। পড়ে আমার মাথা ঘুরছিল! এভাবে ঠকিয়ে তুমি আমাদের! একটা নোংরা বাজারের মেয়ে!....আবার লোকটা কী লিখেছে! আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। লিখেছে পঁচিশ হাজার টাকা তার চাই। যদি টাকাটা না দিই তাহলে চিঠির কপি সে পাঠাবে আমার বসের কাছে। আমার চরিত্র নিয়ে সে কুৎসা রটাবে আমার যারা পরিচিত তাদের কাছে!...এখন আমি কী করি?...আমি কী করি?...বিড়বিড় করছিল দেবদ্যুতি। আর ঘরময় পায়চারি করছিল।—লোকটা আবার আসবে। আমি যদি টাকা না দিই তাহলে সে আমার স্যোশাল ইমেজ নষ্ট করে দেবে। কিন্তু টাকা একবার দিলে বারবার দিতে হবে। সে বড় কঠিন চক্কর!

—আমি যদি এ বাড়ি থেকে চলে যাই তোমার সমস্যা মিটবে?

—আমি যদি চলে যাই?...বিশ্রিভাবে ভেংচে উঠল দেবদ্যুতি। তেড়ে মারতে গেল তাপসীকে। তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বলল—শালী বাজারের নোংরা মেয়ে! তোর গায়ে হাত দিতেও ঘেন্না করে! বেরো তুই এখন বাড়ি থেকে! বেরিয়ে যা! তোর সঙ্গে থেকে এডসের জারম আমার শরীরে এল কিনা কীভাবে জানব?...ওহ কী সাংঘাতিক! তুই এখন বেরোবি না আমি জানি। গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবি। তবে তোর সঙ্গে আমি একমুহূর্ত থাকব না। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। শালা কোনও হোটেলে রাত কাটাব সেও ভি আচ্ছা। তবে আগামীকাল বিকেলের মধ্যে তুই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। চাবি রেখে যাবি সামনের ফ্ল্যাটের দত্তদের কাছে। ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে আছে। তাও চাবি ওদের কাছে রেখে নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে কেটে পড়বি। যদি চাবি নিয়ে চলে যাস তাহলে তোর নামে চুরির কমপ্লেন করব থানায়। শুনেছিস হারামজাদী! দেবদ্যুতি আর দাঁড়াল না। একটা হ্যাভারস্যাকে নিজের জিনিসপত্র দ্রুত হাতে ভরে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় সে বেসিনে কয়েকবার থুতু ফেলল। হিস্‌হিস্‌ করে বলল—ইউ গো টু হেল! ইউ লায়ার! ইউ ডার্টি হোর...।

তাপসীর কিছুই মনে হচ্ছিল না। কান্না পাচ্ছিল না একটুও। দেবদ্যুতি চলে যাওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে ধ্বংসস্তূপের প্রতীক হয়ে বসে রইল চুপচাপ। তারপর চানঘরে গেল। বেসিনে নীচু হয়ে বমি করল হড়হড়িয়ে। শরীরটা হালকা হল। তারপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল। নিজেকে মনে হচ্ছিল জলপ্রপাতের অংশ...।

সতেরো

গত রাত বিনিদ্র কাটার কথা ছিল তাপসীর। কিন্তু তাতো হল না। বেশ ভালোই ঘুম হল। ঠিকমতো বললে বেশ গভীর ঘুমিয়েছিল তাপসী। মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে যে আসামী ফাঁসির আগের দিন রাতে সেও কি একরকম গভীরভাবে ঘুমোতে পারে? হয়তো পারে। কেননা সে তো জেনে গেছে জীবনের অসহ্য ভার তাকে আর বইতে হবে না। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোনও কিছুই তার কাছে কোনও অর্থে তাৎপর্যময় নয় আর। সে স্বাধীন। সম্পূর্ণ স্বাধীন। মৃত্যুই তার সামনে এক এবং অদ্বিতীয় অধীশ্বর। যাকে সে কুর্নিশ জানাবে অল্পকাল পরেই। একমাত্র মৃত্যুই জানবে সেই আসামীর অন্তিম যন্ত্রণার কথা। সে নিজে জানবে না বুঝবে না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাপসীরও অবিকল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান আসামীর মতো মনে হচ্ছিল নিজেকে। চানঘরে অবাধ নগ্নতার মতো তার জীবন এখন নগ্ন, প্রতিক্রিয়াহীন, যে কোনও রকম দুশ্চিন্তাহীন। তার বিষয়ে সব জানা হয়ে গেছে দেবদ্যুতির। সেই গরল-সত্য জানার পর দেবদ্যুতির প্রতিক্রিয়া কী তাও দেখেছে তাপসী। আঘাত পেয়েছিল গতরাতেই। এখন, এই সুন্দর একটি দিনের সূচনায় সেই আঘাত সামলে নিয়েছে। তবে কষ্টটা আছে বুকের মধ্যে, ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলা আগুনের মতো। কষ্ট এই;—দেবদ্যুতিকে সে ভেবেছিল দীর্ঘদেহী একজন পুরুষ। কিন্তু গতরাতে জেনেছে দেবদ্যুতি একজন হাস্যকর বামন ছাড়া কিছুই নয়।

ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ আনমনে শুয়ে রইল তাপসী। কত কী ভাবল। দাদার কথা ভাবল। মায়ের কথা ভাবল। বোনের কথা ভাবল। মাত্র আধঘণ্টার একটা স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের মতো তাপসীর এই বত্রিশ বছরের জীবন তার উদাসীন চোখের সামনে যেন প্রদর্শিত হল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আজ থেকে আবার অনিশ্চয়তার জীবন শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, সে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। আজ দুপুরেই সে দেবদ্যুতির এই আশ্রয় ছাড়বে। নিজের যা কিছু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে, এই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করে চাবিটা সে দিয়ে যাবে বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটের শান্তশিষ্ট, ছোটখাটো, লাজুক স্বভাবের বউটিকে। যদি তার জীবনটা ঠিক ঠিক সরলরেখা ধরে চলত, তাহলে কি সে কাটাতে পারত ঐ বউটির মতো নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব বিশ্রামের একটা জীবন? কে জানে? এখন এসব ভাবার কোনও মানে হয় না আর। আজ থেকে আবার শুরু হয়ে গেল তাপসীর অনিশ্চিত জীবন। প্রথমে সে কোথায় যাবে? কোথায় আবার?

অশোকনগরের পিসতুতো দিদি পারমিতার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়া ছাড়া আর তার কী গতি আছে? পারুদি তাকে তাড়াবে না তাপসী জানে। ঠিক আশ্রয় দেবে। আর পারুদি তো পার্টিও করে। এলাকার বেশ ডাকসাইটে মহিলা-নেত্রী। ছোটখাটো একটা চাকরি-বাকরি ঠিক জুটিয়ে দেবে তাপসীকে! চারদিকে আজকাল এত নার্সিং-হোম। কোনও একটিতে নার্সের চাকরি কি জুটবে না তার? আর থাকার জন্যে ভদ্রস্ত একটা মহিলা হোস্টেল? পারমিতাদি ঠিক যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেবে। তারপর বাকি জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে একঘেয়ে এবং বৈচিত্রহীন একটা ছন্দে। ক্রমশ বুড়ি হয়ে যাবে একদিন। তারপর বৃদ্ধাশ্রম।

একটু বেলা হলে ডোর-বেল বাজল। কে আসতে পারে? আই-হোলে চোখ রেখে প্রথমে চমকে উঠল তাপসী। তারপর প্রবল এক রাগের ঢেউ তাকে তছনছ করে দিল। অশ্বিনী এসেছে। অশ্বিনী! কেন এসেছে? দেবদ্যুতির হাতে তাপসীর অপমান এবং নির্যাতন নিজের চোখে দেখতে? মুহূর্তে তাপসীর মনে হল, ঐ লোকটাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। হ্যাঁ, মোক্ষম শাস্তি। তার জীবনে আজ যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার জন্যে দায়ী তো অশ্বিনী। এই লোকটা তাকে ঠকিয়েছে। তার ভালোবাসাকে অপমান করেছে। তাকে নষ্ট করেছে। তার যে শারীরিক পবিত্রতা বলে আজ আর কিছু নেই সেজন্য দায়ী অশ্বিনী। এই বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয় যে তাকে ছাড়তে হচ্ছে তার জন্যেও দায়ী অশ্বিনী। চরম সর্বনাশ করেও কি অশ্বিনী তাকে মুক্তি দেবে না? দিনের পর দিন লোকটা তাকে ব্ল্যাকমেল করেছে। এখন তাপসীকে জড়িয়ে দেবদ্যুতিকেও ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। আজও এসেছে কেন? কেন? তাপসীর মনে হল, অশ্বিনীর যাবতীয় অপরাধের হিসেব চুকিয়ে দেবার অমূল্য সুযোগ সে আজ নিতান্ত অযাচিতভাবে পেয়ে গেছে।

নাইটির ওপর হাউসকোট চাপিয়ে দরজা খুলল তাপসী।

—এসো—মিহি স্বরে অশ্বিনীকে ডাকল। তাপসীর মুখের দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকাল অশ্বিনী। তাপসীর থেকে এরকম মিহি ডাক সে যেন আশাই করেনি।

—ওমা বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভেতরে আসবে না?

—যাবো?...অশ্বিনী সত্যিই দ্বিধাদীর্ণ। সে বুঝতে পারছে না পরিস্থিতি। তাপসীকে এত শান্ত মনে হচ্ছে কেন? তাহলে কি দেববাবু সব জেনেও কিছু বলেনি তাপসীকে? অশ্বিনীর সঙ্গে তাপসী একদা স্বামী-স্ত্রীর জীবন কাটিয়েছে এই নিদারুণ সত্য জেনেও দেববাবু তাপসীকে কিছু বলবে না? নিজের 'সোশ্যাল ইমেজ' বাঁচাতে দেববাবু কি হাত মেলাবে না অশ্বিনীর সঙ্গে? টাকা দিয়ে অশ্বিনীর মুখ বন্ধ করতে চাইবে না? পরিস্থিতি কোন্‌দিকে ঝুঁকে আছে এটা বুঝতেই তো অশ্বিনী এসেছে এ-বাড়িতে?

বসার ঘরের সোফাতে নিজেকে ছেড়ে দিল অশ্বিনী। তাপসী আগের থেকে আরও মিহি গলায় জানতে চাইল—চা চলবে তো?

—চলবে...কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—দেববাবু তোমাকে কিছু বলেননি?

—কী আবার বলবে?...ও হ্যাঁ তোমার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেচে।

—আমার জন্যে...চিঠি?

—হ্যাঁ...দাঁড়াও আনি। তাপসী ঝাঁ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল তখন তার হাতে চিঠি নয়। একটা লোহার বালতি। বেশ বড় বালতি। পুরনো। কবে থেকে এই বালতিটা সে চানঘরে দেখছে। বালতিটা ড্রামের মতো জল ভরে রাখার কাজে ব্যবহৃত হত। সব জল ফেলে দিয়ে ফাঁকা লোহার বালতিটা হাতে নিয়ে এসেছে তাপসী। কী করবে? অশ্বিনীকে শাস্তি দেবার জন্যে জবরদস্ত একটা অস্ত্র খুঁজছিল সে। নিদেনাপক্ষে একটা লোহার হাতুড়ি। কিন্তু কিছুই নেই। এমনকী একটা লাঠিও না। দেবদ্যুতি নিরস্ত্র জীবন এত ভালোবাসে?

ঘরের দরজার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল অশ্বিনী। কিছুই বোঝেনি। তাপসীর পায়ের শব্দে ঘাড় ঘোরাতেই সবেগে তার মাথায় নেমে এল নিরেট লোহার বালতির আঘাত। মনের সব রাগ, ক্ষোভ, হতাশা এবং শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে তাপসী অশ্বিনী মাথায় বারবার আছড়াচ্ছিল বালতি। ঠং ঠং শব্দ! আশ্চর্য! প্রতিরোধ করার সুযোগ যে থাকবে না অশ্বিনীর এটা হয়তো স্বাভাবিক। তা বলে আর্তনাদও কি সে করবে না?...কিন্তু কোথায় আর্তনাদ? কঁক করে একটা অস্ফুট আওয়াজ উঠেছিল অশ্বিনীর মুখ দিয়ে। প্রথম আঘাতেই সে সোফা থেকে উল্টে ধপাস করে পড়েছিল মাটিতে। তাপসী ঠেলে উঠবার কোনও সুযোগই দিতে চায়নি অশ্বিনীকে। মত্ত হস্তিনীর প্রাবল্যে সে উপর্যুপরি আঘাত হানছিল ভারি লোহার বালতি দিয়ে অশ্বিনীর মাথায়। একবার...দুবার...তিনবার....চারবার... পাঁচবার... বারবার বারবার! অশ্বিনীর মাথা ফেটে চৌচির। বোধহয় ঘিলুও ছিটকে গিয়েছিল মেঝের এখানে ওখানে। রক্ত...রক্ত...রক্ত...! অশ্বিনীর সিড়িঙ্গে শরীরে এত রক্ত ছিল? গাঢ়, লাল টকটকে রক্ত! তাপসীর আকাশ-নীল হাউসকোটেও অশ্বিনীর লাল রক্ত ছিটকে লেগেছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিল তাপসী। অশ্বিনীর শরীর কাঁপতে কাঁপতে যে কখন নিস্পন্দ হয়ে গেছে খেয়ালও করেনি। খেয়াল হল তখন, যখন নিজের হাত দুটোই অবশ লাগল। যখন মনে হল তার হাতদুটো আর হাতের জায়গায় নেই। কাঁধ থেকে খসে গেছে। উধাও হয়ে গেছে কোথাও রক্তের বীভৎস প্রবাহে...।

অশ্বিনীর রক্তাক্ত মৃতদেহের সামনে কতক্ষণ বসে ছিল তাপসী তার খেয়াল ছিল না। এখন একটু সুস্থ বোধ করছিল সে। হাঁফাচ্ছিল না। বুক ধড়ফড়ানি বোধ করছিল না আর। তারপর একসময় তার খেয়াল হল এবার একটা ফোন করতে হবে। লোকাল থানার ফোন-নম্বর কত?.... আর কিছু না পড়ুক প্রতিদিন খবরের

কাগজটা তো পড়ে। ঠিক দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকে—পরিষেবা কলামে— আপৎকালীন ব্যবস্থা...। লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলের ফোন-নম্বর তো সেখানে ছাপা থাকে।

খুব শান্তভাবে নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করছিল তাপসী। দুবার এনগেজড টোন। তিনবারের বার ওপ্রান্ত থেকে ঈষৎ বিরক্তির গলায় কেউ একজন জিজ্ঞেস করল—হ্যালো?

তাপসী দেবদ্যুতির ফ্ল্যাট যে এলাকায় তার একটা আইডিয়া দিল। তারপর খুব শান্ত স্বরে বলল—আপনাদের একবার এই ফ্ল্যাটে আসতে হবে তাড়াতাড়ি। আমি একজনকে নিজের হাতে খুন করেচি। লোহার বালতি দিয়ে লোকটার মাথায় মেরে। আমাকে পাবেন। বালতিটাকেও পাবেন। ডেড-বডি তো পাবেনই। ডেড-বডির সামনে, চারিদিকে রক্ত, কতক্ষণ একলা বসে থাকব বলুন তো?...।

ঐদিন সকালেই ধর্মতলা থেকে বাস ধরে ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছিল দেবদ্যুতি। উদ্দেশ্যহীন ছিল তার সেই যাওয়া। মনের অসম্ভব অস্থিরতা ঘোচাতে কোথাও যেতে হবে,—নির্জন এবং অল্প-চেনা কোনও জায়গায়, তাই যাচ্ছিল। ডায়মন্ডহারবারে আগে এসেছে দেবদ্যুতি। সাগরিকা হোটেলে থেকেওছে। সরকারি বাস গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই দেবদ্যুতির মুঠোফোন চেনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে বেজে উঠেছিল। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নম্বরটিকে অচেনা মনে হয়েছিল। ভুরু কুঁচকে ফোনের বোতাম টিপে হ্যালো বলতেই বক্তার পরিচয় পেল। থানার অফিসার-ইন-চার্জ। তারপর শুধু শুনে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। বিপন্ন বিস্ময়ে শুনেছিল।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ পুলিশ-ভ্যানে তাপসীকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। আদালত-চত্বরে টিভি-চ্যানেলগুলোর প্রতিনিধিরা ক্যামেরা নিয়ে হাজির থাকে প্রায় সবসময়েই। কখন কোন অপরাধীর ফোটো নেবার সুযোগ হয়। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীরা মুখে তোয়ালে কিংবা ঐ ধরনের কোনও বস্ত্র ঢাকা দিয়ে থাকে। তারা জানে টি-ভি চ্যানেলগুলোর পেশাদার বদান্যতায় তাদের অপরাধী মুখগুলো সারা দেশের নানা প্রান্তে অগুন্তি মানুষজনের কাছে চিহ্নিত হয়ে যাবে। অপরাধীরা চিহ্নিত হতে অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো ভয়ও পায়। সকলের কাছে অপরাধী হিসেবে পরিচিত হয়ে যাবার ভয় ও লজ্জা। কিন্তু সেদিন সকালে আদালতে হাজির হবার সময় তাপসীর মুখ কোনও আবরণে ঢাকা ছিল না। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই সে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছিল। তবে হাসেনি। মুখটা যথাসম্ভব ভাবলেশহীন রেখেছিল। হাসলে অবশ্য খুবই বাড়াবাড়ি হত।

ভিড়ের মধ্যে থেকে পুলিশ-প্রহরায় চলমান তাপসীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল দেবদ্যুতি। কী বলবে কিছুই বুঝতে পারেনি। কীরকম বোকা-বোকা মনে হচ্ছিল নিজেকে।

তাপসী ভাবলেশহীন মুখে একবার তাকিয়েছিল দেবদ্যুতির দিকে। কিছু বলতে চায়নি। কী বলবে? যখন অনেক কথা বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে তখন মূক থাকাই ভালো।

তাই দেবদ্যুতিকে কিছু বলতে চায়নি তাপসী। পৃথিবীর কাউকেই বোধহয় তার কিছু বলার ছিল না।